ছোট্ট সোনার
গল্প শোনা
শৈলেন ঘোষ

ছোট্ট সোনার গল্প শোনা

ছোট্ট সোনার গল্প শোনা

শৈলেন ঘোষ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৭৬ সপ্তম মুদ্রণ ফাল্গুন ১৩৯৪

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ বিমল দাশ

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ৮·০০
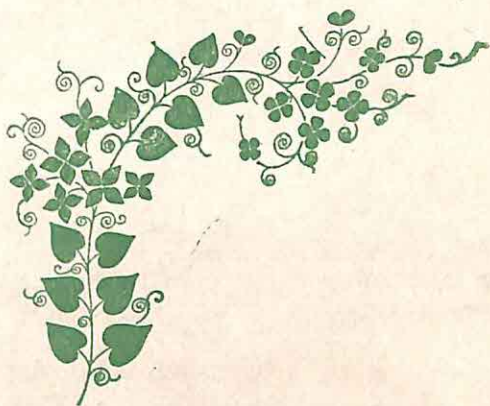
ছোট্ট সোনা, মিষ্টি সোনা,
সব সোনাদের হাতে,
মায়ের কাছে গল্প শোন
ঘুম-নিঃঝুম রাতে।

কোন পাতায় কোন গল্প

রাজার পায়ের বুড়ো আঙুলের অসুখ করেছে। কেউ সারাতে পারে না সে-অসুখ। এক করতে আর এক হয়। রাজার পায়ের বুড়ো আঙুলটা ফানুস হয়ে ওপরে উঠে গেল। কড়িকাঠে আটকে গেল। কী কান্ড!

টুং-এর বন্ধু ঝুমঝুমি

টুং। একটি ছেলের নাম।

কেউ যখন ডাকে ওর নাম ধরে, মনে হয় কে যেন টোকা মারল জলতরঙ্গে। বেজে উঠল টুং। ভারি মিষ্টি!

ভারি মিষ্টি ছেলেটি। ছোট্ট। ডাগর ডাগর দুটি চোখ। খুশির মত আলো ছড়িয়ে রয়েছে চোখ দুটিতে। চোখ দুটি মেলে থাকে টুং ঐদিকে। ঐ যেদিকে বনটা স্বুরু হয়েছে।

ছোট্ট ঘরটি তাদের। মাটির। বনের ধারে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন আঁকা ছবি। সত্যি! ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি। টুং এঁকেছে। রঙ-ঝিলমিল ফুল। লাল-টুকটুক পাখি। রূপা-ঝুরঝুর মাছ। বাবা কিচ্ছু বলে না টুংকে। ও যত পারে আঁকে। আঁকে আর মোছে। যখন পারে না টুং, বাবা এঁকে দেয়।

না, টুং-এর কেউ নেই বাবা ছাড়া। বাবা মাটির কাজ করে। মাটির কলসি গড়ে। হাঁড়ি-গেলাসে নক্সা কাটে। আলপনা দেয়। তারপর নৌকো চেপে হাটে যায়। সেখানে বেচে আসে। বাবা বলেছে, আর একটু বড় হলে টুংও যাবে। টুং যাবে হাটে। বাবার

সঙ্গে। হাঁকতে হাঁকতে ফিরি করবে, "হাঁড়ি চাই, কুঁজো চাই। কলসি নে—বে।"

রোজ সন্ধেবেলা বাবা যখন হাট থেকে ফিরবে, জিলিপি কিনে আনবে টুং-এর জন্যে। একদিন জিলিপি। কোনদিন জিবেগজা। আর একদিন সিঁড়ির নাড়ু। ঘরে ফিরে ঢোলক বাজাবে বাবা। গান গাইবে।

টুংও ঢোলক বাজাতে পারে। বাবা যখন থাকে না ঘরে, টুং গলায় ঢোলক ঝুলিয়ে বাজায় আর গান গায়।

খুব সকাল সকাল উঠবে টুং। খুব সকাল। তখন একটু একটু আলো ফুটবে। একটু একটু সোনালী আলো গাছের পাতায় ছড়িয়ে পড়বে। একটি একটি পাখি ডাকবে। তখন ও ছুটবে। ঘর থেকে বাইরে। ছুটতে ছুটতে নদীর জলে লাফিয়ে পড়বে। নদীর জলে নেচে উঠবে। সাঁতার কাটবে। ডুলবে। ডুলতে ডুলতে ইচ্ছে হয় নদীর ওপারে চলে যায় টুং। নদীর ওপারে বনটা যেখানে খুব গভীর। কেউ যায় না ওদিকে। বাবা বলে, ওদিকে নাকি একটা দত্যি আছে! ভারি শয়তান! সে নাকি এক রাজকন্যাকে চুরি করে এনে বন্দী করে রেখেছে ঐ বনে।

মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ গভীর বনে লড়াই করে আসে টুং শয়তানটার সঙ্গে।

ধ্যাৎ! ভয় না আর কিছু! বনে ঢুকতে একটুও ভয় করে না ওর। বাঘ না ঘেঁচু। ভালুক না ছাই। এক-এক দিন ও যখন শুকনো পাতা কুড়ুতে যায় বনে, ডাল ভেঙে আনে গাছের, তখন ভয় করে ওর? মোটেই না। তখন বাঁদরগুলো ওকে দেখে কেমন হুটোপাটি লাগিয়ে দেয় গাছে! ডালে ডালে! টুং তখন মজা করে চেঁচাবে, "এই বাঁদর, কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি?" বাঁদরগুলো কিঁচ কিঁচ করে ডাকবে ওর কথা শুনে। লাফাবে কেমন!

একবার ছবি এঁকেছিল টুং কাগজে। একটা পাখির ছবি। ছবির

নিচে লিখেছিল ঃ

"দত্যির হাতে বন্দিনী রাজকন্যার জন্যে আমার উপহার।

ইতি—তার অচেনা ভাই টুং।"

তারপর একটা বাঁদরকে "আয় আয়" বলে ডেকেছিল টুং। তাকে সত্যি সত্যি একছড়া কলা দিয়েছিল। হ্যাঁ, সেই ছবির কাগজটা একটা স্থতো দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছিল বাঁদরের গলায়। বলেছিল, "বন্দিনী রাজকন্যাকে পৌঁছে দিবি।"

কি বুঝল কে জানে। হাতে কলা নিয়ে বাঁদরটা মারল লাফ। একেবারে গাছের ওপর। ছবিটা দুলছে গলায়। তারপর গাছে গাছে লাফাতে লাফাতে কোথায় যে চলে গেল জানে না টুং। দেখতেই পেল না আর।

না, আর কোনদিনই দেখতে পায় নি টুং সেই বাঁদরটাকে। কতদিন খুঁজেছে। হয়তো বাঁদরটা সত্যি সত্যি চলে গেছে সেই রাজকন্যার কাছে। এখন হয়তো বন্দিনী রাজকন্যা টুং-এর আঁকা ছবি দেখছে। হয়তো কাঁদছে। ভাবছে, কে অচেনা ভাইটি তার!

বাঘ অবিশ্যি টুং কোনদিন দেখে নি। বাঘের ডাক শুনেছে। দেখলেই বা কী! বাঘকে মোটেই ভয় পায় না টুং। কতদিন তো ও বাঘ খুঁজেছে ঐ বনে বনে। তীর-ধনুক নিয়ে। অবিশ্যি বনের অনেক ভেতরে তো আর যাওয়া যায় না। কেউ-ই যেতে পারে না। তবু মাঝে মাঝে ওর যেতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে, বনের গাছের সঙ্গে গাছ হয়ে, ফুলের সঙ্গে ফুল হয়ে, বাঘের সঙ্গে বাঘ হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তা তো হবার যো নেই!

আজ মেঘ করেছে।

তখনও পর্যন্ত জানত না টুং আজ মেঘ করবে। কেমন করে জানবে? বাবা তো কোন সকালে হাটে বেরিয়েছে। আকাশ তখন রোদ-ঝিলমিল। এখন কালো ঘুরঘুট্টি। মেঘ করলে টুং-এর মনটা কেমন যেন আনমনা হয়ে যায়। জানলায় মুখটি বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে টুং। চেয়ে চেয়ে দেখে। দেখে বাইরেটা। আকাশটা। আর দেখে গাছে গাছে, সবুজে সবুজে ঢাকা বনটা। মেঘ যায় কোথা ঐ নীল আকাশের গা বেয়ে? ভাবে টুং।

টুপ টুপ! বিষ্টি নামল। মুখখানি খুশিতে উছলে গেল টুং-এর। ছুট্টে বাইরে বেরিয়ে গেল। চেঁচিয়ে ডাকল, "আয় বিষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে।"

দেখতে দেখতে ঝমঝমিয়ে বিষ্টি নেমে এল। ছুট দিলে টুং। ছুটছে ও। জলে ভিজছে। ছুটবে ও যেদিকে পা তুটি যায়। গাছের পাতায় পাতায় নাচছে বিষ্টির ফোঁটারা। মাটিতে নাচছে ওর পা তুটি। ও আজ থামবে না। মানবে না। চলে যাবে টুং বন্দিনী রাজকন্যার কাছে ছুটতে ছুটতে। ঐ বনের মধ্যে।

বনেই ঢুকল টুং। একেবারে ভিজে নেয়ে গেছে। বনের গাছে গাছে, সবুজ পাতার নিচে নিচে ও আনন্দে নেচে উঠল। গুড়-গুড়-গুড় মেঘ ডাকল, ও থামল না। কড়-কড়-কড় বাজ পড়ল, ও শুনল না। ও ছুটল। যেন হরিণ। ছোটে আর বনের সবুজে লুকিয়ে পড়ে। লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে টুং। এদিক ওদিক। দেখে গাছ আর গাছ। শুধু গাছ। কই, ডালে ডালে আজ একটিও তো বাঁদর নেই! একটিও তো পাখি দেখতে পাচ্ছে না টুং! কাঠবিড়ালিরা তো ছুটছে না তুড়ুক-তুড়ুক, এডাল ওডাল। সব্বাই আজ লুকিয়ে পড়েছে। বাব্বা! বিষ্টিকে এত ভয়!

ভয় নেই টুং-এর একটুও। ও শুধু আজ একা। একা ঘরের বাইরে। ও তাই হাসবে। গাইবে। ডাকবে।

টুং সত্যি সত্যি ডাকল। ডাকল গাছের দিকে চেয়ে, "ও পাখি, ও পাখি, কোথা তোমরা?"

কোন সাড়া পেল না।

চেঁচাল, "কাঠবিড়ালি, কাঠবিড়ালি, বিষ্টিকে এত ভয়!"

সব চুপচাপ।

না, না, চুপ তো নয়! কী যেন একটা কুঁৎ কুঁৎ করে ডাকছে!

ছুটতে ছুটতে থামল টুং। থমকে চাইল। কিসের শব্দ! কে ডাকে? খুঁজল। বুনোগাছের ঝোপঝাড় হাত দিয়ে সরিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ চমকে ওঠে টুং।

ওমা! ওমা! ওটা কী?

ছুট্টে এগিয়ে গেল টুং।

আরে! এ যে একটা ভালুকছানা! জলে-কাদায় গড়াগড়ি যাচ্ছে! ছিঃ ছিঃ! মা কোথা ওর?

টুং ভালুকছানার গায়ে হাত বুলালে। আহা-রে! কাঁপছে। কোলে তুলে নিল টুং। ছোট্ট তো! একদম কষ্ট হল না। চোখের দিকে চাইল টুং। চোখ দুটো কেমন পিটপিট করছে ছানার। মাথায় হাত দিলে। ইস! জলে ভিজে শপশপ করছে। মুছে দিলে। গায়ে কাদা লেগেছে, ফেলে দিলে। জিজ্ঞেস করলে, "তোর মা কোথা?"

ভালুকছানা কি টুং-এর কথা বুঝতে পারে? কী বুঝবে? কাঁপছে। কুঁৎ কুঁৎ কুঁৎ ডাকছে। জুলুক জুলুক চাইছে।

বুঝতে আর বাকি রইল না টুং-এর। মা পালিয়েছে। ঠিক পালিয়েছে। বিষ্টি দেখে ছেলেকে ফেলে পালিয়েছে। ইস! দয়া-মায়া নেই মায়ের! মা বুঝি আবার এমনি হয়? এমনি নিষ্ঠুর?

তবু ডাকল টুং, "ও ভালুকমা, ও ভালুকমা, তোমার ছেলে কাঁদছে।"

বয়েই গেছে। কে সাড়া দেবে? ভালুকমা কাছে-পিঠে থাকলে তবে তো! যা বিষ্টি!

তবু এধার ওধার একটু খুঁজল টুং।

পেল না দেখতে। ভাবলে, জলের মধ্যে, বনবাদাড়ে বেশিক্ষণ না থাকাই ভাল। ছানাটার অসুখ করলে! এখন ওকে নিয়ে ঘর যাই। পরে ওর মাকে খুঁজে বার করব।

ভালুকছানাকে কোলে নিয়ে ছুট দিল টুং। ঘরের দিকে।

ঘরে যখন পৌঁছুল তখনও বিষ্টি পড়ছে। কমে এসেছে অবিশ্যি। তখনও বাবা আসে নি। ভালুকছানার গাটা ও চটপট মুছে দিল।

শুকনো শুকনো পাতা বিছিয়ে বিছানা করল। ছানাকে শুইয়ে দিলে। ছানার গায়ে বেশ করে একটা কাপড় চাপা দিলে। মাথার গোড়ায় বসল টুং। হাত বুলিয়ে দিল গায়ে-মাথায়। ঘুমিয়ে পড়ল ভালুকছানা। ঘুমুবে না? বাব্বা! কী কষ্ট! ঐটুকু তো প্রাণ! কতক্ষণ কষ্ট সইবে?

পরেরদিন ভালুকছানা চুক-চুক-চুক দুধ খেল। টুং-এর দিকে চেয়ে চেয়ে ফিক-ফিক-ফিক হাসল।

"দুষ্টু!" টুং গালটা টিপে দিলে ভালুকছানার। ভালুকছানা শুয়ে পড়ল মাটিতে। গড়াগড়ি লাগিয়ে দিলে। টুং হাততালি দিয়ে হেসে উঠল। নেচে উঠল। বললে, "চ, তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসি।"

টুং ভালুকছানাকে নিয়ে বনে ছুটল।

টুং বনে বনে ডাকল।

বনে বনে ছুটল।

বনে বনে হাঁটল।

দেখতেই পেল না ভালুকছানার মাকে।

ফিরে এল টুং। আর যায় নি কোনদিন। গিয়ে কি হবে? যার ছেলে তারই মাথা-ব্যথা নেই! মনটা খারাপ হয়ে গেল টুং-এর।

তাই একদিন টুং বললে, "ভালুকছানা, ভালুকছানা, আমার সঙ্গে হাঁটবি?" বলে টুং হাঁটল।

টুং হাঁটল, টুক-টুক, টুক-টুক।

ভালুকছানা টুং-এর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে হাঁটতে লাগল, থুপ-থুপ, থুপ-থুপ।

আর একদিন টুং বললে, "ভালুকছানা, ভালুকছানা, আমার সঙ্গে ছুটবি?" বলে টুং ছুটল।

টুং ছুটল, পাঁই-পাঁই, সাঁই-সাঁই।

ভালুকছানা টুং-এর দিকে দেখতে লাগল। দেখতে দেখতে

ছুটতে লাগল, থপ-থপ, থপ-থপ।

টুং-ও ছোটে, ভালুকও ছোটে।

ছুটতে ছুটতে একেবারে নদীর সামনে। টুং লাফিয়ে পড়ল নদীর জলে।

নদী-নদী জল দেখে থমকে দাঁড়াল ভালুকছানা। দাঁড়িয়ে রইল ডাঙায় চুপটি করে। দেখতে লাগল। দেখতে লাগল নদীর জলে দোল খাচ্ছে টুং। ভারি মজা!

সেইবার নদীতে গেল ভালুকছানা টুং-এর সঙ্গে।

একবার শহরে গেল ভালুকছানা টুং-এর পিঠে।

হাটবার, হাটে গেল ভালুকছানা টুং-এর পিছে।

টুং-এর বন্ধু হয়ে গেল ভালুকছানা।

টুং খাবে, ভালুক চাইবে।

টুং ঘুমুবে, ছানা গড়াবে।

টুং হাসবে, ছানা নাচবে।

তাই একদিন টুং ঘরের দেওয়ালে ছবি আঁকতে বসল।

কী আঁকছে? কী আঁকছে?

ভালুক-ভালুক ছানা আঁকছে।

ভালুকছানার ছবি আঁকছে টুং, আর ছানা-ছানা ভালুকটা বসে বসে দেখছে।

আঁকতে আঁকতে ছবি আঁকা শেষ হল টুং-এর। কিন্তু দেখতে দেখতে দেখা আর শেষ হল না ভালুকছানার। সে দেখছে আর দেখছে।

তাই টুং ডাকল, "ভালুকছানা, আয়, আয়, খেলি আয়।"

ভালুকছানা ছবি-ছবি রঙ দেখছে। গেল না।

টুং বললে, "ভালুকছানা, আয়, আয়, খাবি আয়।"

ভালুকছানা ছানা-ছানা ছবি দেখছে। উঠল না।

টুং বললে, ভালুকছানা, আয়, আয়, শুবি আয়।"

ভালুকছানা ভালুক-ভালুক আঁক দেখছে। নড়ল না।

তখন টুং ঘরে গেল। ঢোলক নিলে। গলায় দিলে। টাক-ডুম-ডুম বোল বাজালে। গান ধরলে।

ছানা তখন তড়বড়িয়ে উঠে পড়ল। তার ছবি দেখা শেষ হল। নড়বড়িয়ে ঘরে ছুটল। ওমা! ওমা! নাচ ধরল। ঢোলক বাজে টাক-ডুম, টাক-ডুম। ভালুক নাচে ঝুমঝুম, ঝুমঝুম।

খিলখিল করে হেসে উঠল টুং। জড়িয়ে ধরল ভালুকছানাকে। নাচতে নাচতে গড়িয়ে পড়ল ভালুকছানা মাটিতে। হাসতে হাসতে ওর গালে একটা চুমু খেল টুং। ছুট্টে গিয়ে ভালুকছানার ছবির নিচে লিখে দিল ঃ

আমার বন্ধু ঝুমঝুমি
ইতি
টুং

তারপর ভালুকছানার গলা জড়িয়ে বললে, "আজ থেকে তোর নাম ঝুমঝুমি! চ, খাবি চ।"

এদিকে ভালুকছানার মা একদিন খুঁজেছে ছানাকে। পায় নি।

দুদিন খুঁজেছে ছানাকে। পায় নি।

ক'দিন পরে ভালুকমা ছেলেকে খুঁজতে খুঁজতে নদীর ঘাটে এল। তখন খুব রাত্তির। নদীর জলে চিকচিক মাছেরা ঝিলমিল নাচছে। ছানা-পোনারা খেলছে। দুল-দুল দুলছে। ভালুকমা সেইদিকে চেয়ে রইল। চেয়ে চেয়ে নিজের মনে কাঁদতে লাগল।

চিকচিক মাছেরা ঠিক দেখতে পেয়েছে ভালুকমাকে। ছানা-ছানা পোনাটা টুপ করে মুখটি তুললে। বললে, "ভালুকমা, ভালুকমা, ঘাপটি মেরে বসে কেন? আমাদের ধরবার মতলব! খাবে বুঝি? তা আর হচ্ছে না।" বলে, ছানা-ছানা পোনাটা জলের তলায় আবার টুপ করে ডুব মারলে। আর সব মাছেদের খিলখিল করে কী হাসি!

কথা শুনে ভালুকমা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

চিকচিক মাছেরা হাসতে হাসতে থামল। বললে, "ও ভালুকমা, ও ভালুকমা, কাঁদছ কেন গো?"

ভালুকমা বললে, "মাছ-চিকচিক, মাছ-চিকচিক, আমি তোদের খেতে আসি নি। আমার ছেলেকে খুঁজতে এসেছি।"

"খুঁজছ কেন?"

"আমার ছেলে যে হারিয়ে গেছে!"

"কে বললে হারিয়ে গেছে? হারায় নি তো!"

ভালুকমা বসেছিল। ধড়ফড়িয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘাড় বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, "তবে? তবে?"

"কেন, সে তো আছে টুং-এর কাছে।"

ভালুকমার মনটা নেচে উঠল। ছটফটিয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কে? কে? সে কে? সে কে?"

"ওমা! টুংকে চেন না? টুং গো টুং। সে সাঁতার কাটে জলে।

কাঠ কাটে বনে।

ঢোলক বাজায় টাক-ডুম-ডুম।

ছবি আঁকে গাছ-মাছ-ফুল।"

ভালুকমা জিজ্ঞেস করলে, "মাছরে মাছ, ঝুন-ঝুন-ঝুন, কোথায় থাকে টুং?"

"আমরা কেমন করে জানব? আমরা থাকি জলে। সে থাকে ডাঙায়। গেছি কোনদিন তার বাড়িতে? খুঁজে নাও না।"

ভালুকমা মাছের কথা শুনে তক্ষুনি ছুটল টুং-এর বাড়ি খুঁজতে। ছুটল সেই রাত্তিরে। অন্ধকারে।

টুং-এর ঘর একটু দূরে নদীর ঘাট পেরিয়ে। একটু বাঁয়ে নদীর ঘাট ছাড়িয়ে।

ভালুকমা একটু একটু হাঁটে। একটু একটু ছোটে। এক-পা এক-পা থামে। এদিক ওদিক দেখে।

দেখতে দেখতে সামনে একটা ঘর পড়ল। ঘরের দাওয়ায় একটা ছাগল ঘুম দিচ্ছে।

ভালুকমা ডাক দিল, "ও ছাগল, ও ছাগল, এটা কি টুং-এর বাড়ি?"

ভালুকের ডাক শুনে ছাগলের ঘুম তো গেছে ভেঙে! চেয়েই চক্ষু ছানাবড়া! তিড়িং করে মারলে এক লাফ! মেরেই ছুট। ছুটল আর চেঁচাল, "ম্যা-এ্যা-এ্যা-এ্যা।"

ভালুকমা তো হতভম্ব! বললে, "যাঃ বাব্বা! ছাগল না তো, পাগল।"

ভালুকমা আবার হাঁটল।

হাঁটতে হাঁটতে আর একটা ঘর দেখলে। এগিয়ে গেল ভালুকমা ঘরের দিকে। দেখলে কী, ঘরের সামনে একটা গাধা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঢুলছে।

ভালুকমা হাঁক দিল, "ও গাধা, ও গাধা, এটা কি টুং-এর বাড়ি?"

গাধার কোথায় ঢুলুনি আর কোথায় কী! ভালুক দেখে চার পা তুলে মারলে লাফ। বাপরে বাপ! বিকট হেঁকে ডাক পাড়লে, "ঘ্যাঙকু, ঘ্যাঙকু।" তারপর দে ছুট। দে ছুট।

ভালুকমা তো ভ্যাবাচাকা। বললে, "যাঃ চলে! গাধা নয় তো, খেঁদা!"

ভালুকমা আবার হাঁটা দিলে।

আর একটা ঘর। একটা হাঁস। বসে আছে। ডিমে তা দিচ্ছে। চুপচাপ।

ভালুক ডাকল, "ও হাঁসমা, হাঁসমা, এটা কি টুং-এর বাড়ি?"

আর দেখতে হয়! ভালুক দেখে হাঁসমায়ের পিলে শুকিয়ে গেল। ডিম ছেড়ে মার ছুট। ছুটতে ছুটতে হাঁক পাড়লে, প্যাঁক-প্যাঁক, প্যাঁক-প্যাঁক।"

ভালুকমা বললে, "দূর তোর! হাঁস নয় তো, হাঁদা!" বলে

আবার পা ফেললে।

হাঁটতে হাঁটতে এবার থমকে দাঁড়ায় ভালুকমা।

কেন?

চমকে চায়।

কেন? কেন? কী দেখল?

পাগল-পাগল ছাগলটা?

না, না।

খেঁদা-খেঁদা গাধাটা?

না, না।

হাঁদা-হাঁদা হাঁসটা?

না, না।

তবে?

দেখল কী, একটা ছোট্ট ঘর।

দেওয়ালে দেওয়ালে ছবি।

ফুল-ফুল-ফুল।

মাছ-মাছ-মাছ।

পাখি-পাখি-পাখি।

আর?

ওমা! ওটা কী? ওটা কী ছবি?

একটা ভালুকছানার ছবি।

ভালুকমা ভালো করে দেখলে ছবির দিকে। তাই তো! তাই তো! ভালুকছানার ছবিই তো! কী যেন লেখা আছে ছবির নিচে! দেখতে পেল না ভালুকমা দূর থেকে। এগিয়ে গেল কাছে। হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট দেখতে পেলে ভালুকমা। ছবির নিচে লেখা :

আমার বন্ধু ঝুমঝুমি

ইতি

টুং

আর দেখতে হয়! ভালুকমা দোর ঠেলল। ওমা! দোর তো

বন্ধ নয়। ঠেলতেই খুলে গেল। উঁকি দিলে ভালুকমা ঘরের ভেতর। চমকে উঠল। ঐতো, ঐতো তার ছেলে! টুং-এর গলা জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। টুংও ঘুমুচ্ছে ভালুকছানার গলা জড়িয়ে।

আঃ! বুকখানা জুড়িয়ে গেল ভালুকমার। ইচ্ছে হল ছুটে যায় তক্ষুনি। টুংকে বুকে তুলে নেয়। ওর গালে চুমু খায়। এত ভালো টুং! দু' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল ভালুকমায়ের।

না, টুং-এর ঘুম না ভাঙে! ঘুম ভাঙতে দেবে না ভালুকমা। খুব আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে গেল। খুব আস্তে। ধীরে ধীরে হাত দুটি সরিয়ে দিল টুং-এর। ঘুমন্ত ঠোঁট দুটি ওর কেঁপে উঠল। একবার। পাশ ফিরে আবার শান্ত হয়ে গেল টুং। ও ঘুমুবে এখন। অনেকক্ষণ।

ভালুকমা আস্তে আস্তে তুলে নিল ছানাকে নিজের কোলে। ঘর থেকে বেরুবার আগে চোখ মেলে দেখল ভালুকমা টুং-এর মিষ্টি মুখখানির দিকে আর একবার। ওর চোখ দুটি ঘুমে ডুবে আছে। কাল সকালে ও যখন উঠবে, যখন দেখবে ওর পাশটিতে বন্ধু নেই, ঐ চোখ দুটি জলে ভেসে যাবে হয়তো তখন।

দাঁড়াল না ভালুকমা। দোর ডিঙিয়ে, ঘর পেরিয়ে বনে পাড়ি দিল।

খুব সকালে উঠেছিল টুং সেদিন। সেদিন ও সবপ্রথম দেখেছিল তার বিছানার পাশটি। না, ছিল না ঝুমঝুমি। ভেবেছিল হয়তো ঝুমঝুমি আজ সকাল সকাল উঠেছে। বাইরে গেছে। এক-এক দিন তো ঝুমঝুমি ঘুম থেকে উঠেই বাইরে ছুটবে। ওর ভালো লাগে হয়তো। ভালো লাগে খুব সকালের মিষ্টি সোনা রোদ। একদিন ঝুমঝুমি একা একা নদীর ধারে চলে গেছল। দেখতে পেয়েছিল টুং। ভাগ্যিস! নইলে নদীর জলে পড়ে গেলে তখন? তখন কী হত?

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল টুং বাইরে। ঘুম চোখে। ডাকল, "ঝুমঝুমি।"

না, ঝুমঝুমি এল না।

আবার ডাকল টুং, "ঝুমঝুমি-ই-ই-ই।"

এবারও দেখতে পেল না।

ঘরের ভেতরটা ভালো করে খুঁজল। ভারি দুষ্টু ঝুমঝুমি। যদি লুকিয়ে থাকে।

না, নেই।

এবার খুব চেঁচিয়ে ডাকল টুং, "ঝুমঝুমি-ই-ই-ই-ই।"

ঝুমঝুমি থাকলে তবে তো!

ডালিমগাছের ফাঁকটা।

নেই, নেই।

শর্ষে ক্ষেতের ঝোপটা।

নেই, নেই।

বার-দরজার কোণটা।

নেই, নেই।

বুকটা চমকে উঠল টুং-এর। কই ঝুমঝুমি? গলায় যত জোর ছিল চেঁচাল সে, "ঝুমঝুমি-ই-ই-ই-ই।"

রোদ দুল-দুল সোনাল ফুল। ভালো লাগে না আজ দেখতে টুং-এর।

রঙ তুল-তুল ফুল পাপড়ি। মন মানে না আজ তা দেখে।

নাচ ঝুমঝুম প্রজাপতি। মন নাচে না সে নাচ দেখে।

কই? কই? তার ঝুমঝুমি কই? না, না, দেখবে না সে। আজ সে কিচ্ছু দেখবে না। আজ শুধু ও খুঁজবে ঝুমঝুমিকে। ও ডাকবে, "ঝুমঝুমি-ই-ই-ই।"

তবে কী ঝুমঝুমি নদীর ঘাটে গেছে?

ছুটল টুং। ছুটল আর ডাকল।

নদীর পাড়ে পাড়ে কাশ ফুলের ঢেউ লেগেছে। ও ডাকে। ফুল দুলে দুলে ওঠে। আরও জোরে। জোরে জোরে। যত জোরে ও ডাকে।

নেই ঝুমঝুমি। এখানেও নেই।

নদীর জলে লাফিয়ে পড়ল টুং। এ-পার ও-পার তোলপাড় করে খুঁজল সে। খুঁজতে খুঁজতে হাঁপিয়ে গেল। পেল না। উঠে পড়ল। ভিজে কাপড়ে ছুটল।

কোথা যাবে টুং ছুটতে ছুটতে?

বনে ছুটল।

ও হাঁপাচ্ছে। তবু দাঁড়াল না।

গলা কাঁপছে। তবু থামল না।

ও ডাকবে। গলায় ওর যত জোর আছে ও ডাকবে, "ঝুমঝুমি-ই-ই-ই।"

মিষ্টি গলা তার কাঁপছে। ভাঙছে।

ছুটছে।

বনের কাঁটা বিঁধল। গা কাটল। কিচ্ছু মানল না।

হোঁচট খাচ্ছে। পড়ছে। উঠছে। তবু ছুটছে আর ডাকছে, "ঝুমঝুমি-ই-ই-ই।"

আর পারল না টুং। পারল না আর ছুটতে। টলে টলে পড়ছে টুং। পা কেটেছে খান-খান। রক্ত পড়ছে। গাছের গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরল টুং টলতে টলতে। কেঁদে ফেলল। হ্যাঁ, এবার সে সত্যি কেঁদে ফেলেছে। হাউ হাউ করে। ওর চোখ দুটি উপছে গেছে কান্নার জলে। ও আর পারছে না। পারছে না দাঁড়িয়ে থাকতে। লুটিয়ে পড়ল। মাটিতে।

আর উঠতে পারে নি টুং। ওর মাথা ঝিমঝিম করছে। হয়তো আর একবার ভালুকছানার নাম ধরে ডেকেছিল টুং। সে-ডাক কারো কানে পৌঁছায় নি। তারপর আর কিচ্ছু জানে না। ওর চোখের পাতা দুটি নেমে এসেছিল কাঁপতে কাঁপতে। ওর হাত দুটি নিস্তেজ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। অজ্ঞান হয়ে গেল টুং।

অনেকক্ষণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে ছিল টুং বনের ছায়ায়। ওর চোখের তারা দুটি অনেকক্ষণ অন্ধকারে ডুবে ছিল।

হঠাৎ যেন ওর চোখের পাতা দুটি কেঁপে উঠেছিল। কানে কানে বেজে উঠেছিল ঝুরঝুর হাওয়ার ঝুমঝুম সুর। শুনতে পেয়েছিল টুং গাছের ডালে ডালে পাখির গান।

হঠাৎ মনে হল যেন, কে ওর গায়ে নরম তুলতুল মখমল বিছিয়ে দিয়েছে! কে যেন ওর বুকের ওপর মাথা রেখে আদর করছে!

চমকে উঠল টুং। না না, মখমল তো নয়। ওমা! ওমা! এ যে ঝুমঝুমি!

আদর করছে ঝুমঝুমি টুং-এর বুকে মাথা রেখে। কাঁদছে ঝুমঝুমির মা টুং-এর পাশে বসে। টুং-এর পা দুটি কেটে গেছে। চেটে দিচ্ছে। আহা! রক্ত যেন না বেরয় আর!

কোথা ছিল ওরা?

লাফিয়ে উঠল টুং! জড়িয়ে ধরল ঝুমঝুমিকে বুকের মধ্যে। "দুষ্টু, দুষ্টু" বলে খুশিতে কেঁদে ফেলল টুং। ওর চোখ দুটি জলে জলে টুপ-টুপ। ঝুমঝুমির গালে চুমু খেল টুং। খুশিতে লুটিয়ে গেল। দেখল না ঝুমঝুমির মায়ের দিকে। মায়ের কান্নায় ভরা চোখ দুটির দিকে।

না, না। ও এখন আর দেখবে না কিচ্ছু। ও খুঁজে পেয়েছে। খুঁজে পেয়েছে ঝুমঝুমিকে। ও এখন গাইবে। ও এখন নাচবে।

ও এখন ঝুমঝুমিকে বুকে নিয়ে বনের ছায়ায়-ছায়ায় ছুটে বেড়াবে।

"টুং।" কে যেন ডাকল। অনেক দূর থেকে।

বাবা ডেকেছে। বাবা যে খুঁজছে টুংকে।

"টুং রে-এ-এ-এ।" আবার ডেকেছে।

"বাবা-আ-আ-আ।" টুং সাড়া দিয়েছে।

ছুটল টুং ঝুমঝুমিকে পিঠে নিয়ে।

খুশি, খুশি! চারদিকে আজ খুশির দোলা।

ঠিক তক্ষুনি রোদ ঢুল-ঢুল সোনাল ফুল ডালে ডালে নেচে উঠল।

রঙ ঝুর-ঝুর ফুল কুঁড়িতে প্রজাপতি নাচ ধরল।

কারা যেন জলতরঙ্গ বাজাচ্ছে। নাচের তালে তালে বেজে উঠছে, টুং, টুং।

না, না, জলতরঙ্গ নয়! বাবা ডাকছে টুংকে, "টুং, টুং, টুং।"

টুপ, টুপ, টুপ! জল পড়ছে ভালুকমা'র চোখ দিয়ে। ছলছল চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছে ভালুকমা ছেলের দিকে, টুং-এর দিকে। ওরা কত খুশি! আহা!

সর্দার

দেহটা লোহার মত ছিল সর্দারের। রাজবাড়ির মাহুত-সর্দার।

সর্দার যখন রাজবাড়িতে ছিল, তখন তো এমন বুড়ো ছিল না। সাত-রঙের রেশমি পোষাক পরত। মাথায় পাগড়ি বাঁধত। শুঁড় তোলা নাগরা পরে যখন হাতির পিঠে বসত, মনে হত যেন সাতরাজ্য জয় করে বীর এসেছে।

রাজবাড়ির হাতিশালে কত হাতি! গোনা যায় না। রোজ সকালে সর্দার আসত হাতিশালে তদারক করতে। একটি একটি হাতির গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করত সর্দার। কেমন শুঁড় তুলে সেলাম জানাত তারা! হাতিশালের সবচেয়ে যে ছোট্ট হাতি, তার নাম বাচ্চা। সর্দারকে দেখলে তার কী আনন্দ! একবার শুঁড়টি তুলে ওর হবে না। ক'বার দোল দেবে এদিক ওদিক। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে-নাচিয়ে। সর্দার ওর দু' গালে ছুটি চুমু খাবে। ওর মুখে একছড়া কলা দেবে। তবে ছুটি। তখন ওর নাচন থামবে।

সর্দারের একটি ছেলে। ঝুমরু। তখন ওর বয়েস দশ। রোজ

সকালে সেও বাবার মত সাজত। মাথায় পাগড়ি বাঁধত। রেশমি পোষাক পরত। পায়ে নাগরা দিয়ে বাচ্চার পিঠে চড়ত। খোলা মাঠে বেড়াতে যেত বাচ্চাকে নিয়ে। বাচ্চা হাঁটত। গলার ঘণ্টা বাজত।

রাজবাড়ির ছোট্ট মেয়ে রাজকন্যা। সোনার জানলায় মুখ বাড়িয়ে হাতি দেখে। ঘণ্টা শোনে। হাতির গলার ঘণ্টা শুনতে শুনতে নিজের হাতের চুনি-পান্নার ঝুনঝুনি বাজিয়ে ডাকে হাতিকে। হাতির পিঠে ঝুমরুকে। রোজ। রোজ। রোজ।

একদিন ঝুমরু হাতির পিঠে বসে চেঁচিয়ে রাজকন্যাকে জিজ্ঞেস করেছিল, "রোজ রোজ কী দেখ? ডাক কেন? বেড়াতে যাবে আমার সঙ্গে? হাতির পিঠে চেপে?"

রাজকন্যা চেঁচিয়ে উত্তর দিয়েছিল, "নিয়ে যাবে?"

ঝুমরু বেশ মুরুব্বির মত বলেছিল, "দুষ্টুমি না করলে ভেবে দেখতে পারি।"

"সত্যি বলছি আমি দুষ্টুমি করব না।"

"বেশ, তা হলে যেতে পার।"

তারপর একদিন রাজার গলাটি জড়িয়ে ধরেছিল মেয়ে। আব্দার করে বলেছিল, "বাবা, আমি ছোট্ট হাতির পিঠে চেপে বেড়াতে যাব।"

বাবা বললেন, "কোথা?"

মেয়ে সবুজ ঘাসের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললে, "হোথা।"

রাজা ঘাড় নাড়লেন, "আচ্ছা।"

তাই একদিন বাচ্চাকে সাজান হল। তার পিঠে মখমলের গদি চড়ল। সেপাই তৈয়ার হল।

কন্যা অবাক হল। বাবাকে জিজ্ঞেস করলে, "অত সেপাই কেন?"

বাবা বললেন, "তোমার সঙ্গে যাবে। তুমি যে বললে হাতির পিঠে চেপে বেড়াতে যাবে।"

মেয়ে বললে, "ওমা! ওমা! সেপাই কী হবে? আমি কী যুদ্ধে যাচ্ছি? সেপাই গেলে আমি যাব না।"

"বেশ, তা হলে সর্দার-মাহুত যাক তোমার সঙ্গে।"

"না, না। সর্দার গেলেও যাব না। সর্দারের ছেলের সঙ্গে যাব আমি, একা।"

রাজা প্রথমে একটু থমকে গেলেন মেয়ের কথা শুনে। তারপর কি যেন ভাবলেন মনে মনে। একটু ভেবে সায় দিলেন, "বেশ, তাই হবে।"

তারপর?

ঝুমরু বসল হাতির মাথার কাছে। রাজকন্যা বসল তার পেছনে। পিঠে। সোনা সাজান মখমলের গদি, তার ওপরে।

হাঁটল বাচ্চা।

ছোট্ট হাতি হাঁটল। দুলল। গলার ঘণ্টা বাজল, টুং টাং। রাজা দাঁড়িয়ে জানলার ধারে। সোনার গরাদ ধরে। দেখতে লাগলেন। শুনতে লাগলেন, ঘণ্টা বাজে টুং টাং, টুং টাং। বাজতে বাজতে হারিয়ে গেল ভেসে ভেসে। দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল দূরে দূরে। আরও দূরে।

কতদূর চলে এসেছে বাচ্চা! সামনে নদী। ময়ূরপংখী নাও দুলছে। ভেসে যাচ্ছে। কত পাখি গাছে গাছে। গান গাইছে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ উড়ে যাচ্ছে। রঙিন ডানায় রঙ ঝরছে।

ঝুমরু জিজ্ঞেস করলে রাজকন্যাকে, "কেমন লাগছে?"

রাজকন্যা পাখির দিকে চেয়ে বললে, "বেশ লাগছে। নামব।"

ঝুমরু ঘাড় নাড়লে, "না।"

মেয়ে আব্দার করলে, "হ্যাঁ। একবারটি।"

"দুষ্টুমি করবে না তো?"

"না। সত্যি বলছি।"

"বেশ, তবে নামতে পার।"

বাচ্চা শুঁড়ে জড়িয়ে নামিয়ে দিল রাজকন্যাকে নিচে। রাঙা-

রাঙা মাটিতে।

ছুট দিল রাজকন্যা পিয়াল বনে।

ছুট দিল ঝুমরু তার পিছনে।

শুঁড় নেড়ে ঘণ্টা বাজাতে লাগল বাচ্চা। মজা লেগেছে। টুং টাং। টুং টাং।

"কোথা যাচ্ছ ?" চেঁচিয়ে উঠল ঝুমরু।

ধরে ফেলল রাজকন্যার হাতটি।

"কোথা যাচ্ছ ?" হাঁপাচ্ছে ঝুমরু।

"কোত্থাও না।" হাঁপাচ্ছে রাজকন্যা।

"ছুটছ কেন ?"

"আমি ময়ূরপংখী না-এ চাপব।"

"না।"

"আমি পাখি নেব।"

"না, না।"

"আমি প্রজাপতির পাখায় নাচব।"

"না, না, না।" বলতেই রাজকন্যা ঝুমরুর হাত ছাড়িয়ে নিল। ছুট দিল।

পিয়াল বন।

শাল বন।

মৌ বন।

ছুজনেই হারিয়ে গেল বনের ভেতর।

ঝুমরু ছুটতে ছুটতে ডাক দিল, "রাজকন্যা-আ-আ।"

বনের গাছ, গাছের পাতা কেঁপে উঠল, না-না-না।

এখন কী হবে?

অনেকক্ষণ বনে বনে হাঁটল ঝুমরু। আনমনা। খুঁজল। ভাবল। বুক ওর ভয়ে ভয়ে ছুর-ছুর কাঁপল।

হঠাৎ ছ্যাঁৎ করে চমকে উঠেছে ঝুমরু! টুং টাং, টুং টাং। বাচ্চার গলার ঘণ্টা বাজছে। ইস! এতক্ষণ সে বাচ্চার কথা ভুলেই গেছল। ছুটল সেইদিকে। বাচ্চার কাছে।

ওমা! একী! থমকে গেল কেন ঝুমরু?

কেন?

এতক্ষণ বনে বনে যাকে খুঁজছিল ঝুমরু, সে তো বাচ্চার পিঠেই বসে আছে। কী দুষ্টু রাজকন্যা! কেমন ঠকিয়েছে ঝুমরুকে! কেমন মুচকি মুচকি হাসছে দেখ!

মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে খিলখিল করে হেসে উঠল রাজকন্যা।

লাল হয়ে গেল ঝুমরুর মুখখানা রাগে। লজ্জায়। একটি কথাও আর বললে না। চুপচাপ। উঠে পড়ল শুঁড় জড়িয়ে হাতির পিঠে। পথ চলল।

দুষ্টু-দুষ্টু হাসছে রাজকন্যা। আড়চোখে চাইছে ঝুমরুর দিকে। বললে, "কেমন ঠকালুম!"

কোন উত্তর দিল না ঝুমরু। বাচ্চাকে ঘুরিয়ে দিল।

"রাগ হয়েছে বুঝি?"

তবু উত্তর দিল না। বাচ্চাকে হাঁটতে বলল।

"আর কোনদিন নিয়ে আসবে না আমায় বেড়াতে?"

এখনও উত্তর নেই ঝুমরুর মুখে। বাচ্চা হাঁটল।

"কথা বলবে না আমার সঙ্গে?" জিজ্ঞেস করল রাজকন্যা। "নাই বললে", ঠোঁট উল্টে মুখ ফিরিয়ে নিল রাজকন্যা। চুপচাপ বসে রইল। কারো মুখে কথা নেই।

বাচ্চা হাঁটছে। ঘণ্টা বাজছে, টুং টাং।

একটু পরেই রাজবাড়ি এসে গেল। ঐ দেখা যাচ্ছে রাজবাড়ির চূড়া। রোদের আলো পড়েছে। ঝলমল করছে।

হঠাৎ যেন কেমন করে উঠল ঝুমরুর মনটা। আর তো একটু। একটু পরেই রাজকন্যা অন্দর-মহলে চলে যাবে। তারপরে আর দেখা হবে না রাজকন্যার সঙ্গে। খেলা করবে না।

ইচ্ছে হল কথা বলতে ঝুমরুর। একটি কথা। ভাব করতে। একবারটি।

পারল না। এখন লজ্জা করছে। একটু আগে আড়ি হয়ে গেছে না রাজকন্যার সঙ্গে!

রাজবাড়ির সিংদরজায় ঘণ্টা বাজছে।

দ্বারী হাঁকল, "রাজকন্যা আসছে।"

রাজা নেমে এলেন সিংদরজার কাছে। দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে বাচ্চা। শুঁড় নাড়ছে। খুশিতে দুলছে।

দেখতে দেখতে এস গেল বাচ্চা একেবারে সিংদরজার কাছে। থাকতে পারল না ঝুমরু। জিজ্ঞেস করে ফেলল, "আবার কবে যাবে বেড়াতে? আমার সঙ্গে?"

না, শোনা গেল না ঝুমরুর কথা। ঘণ্টা বাজছে যে সিংদরজায়। কেমন করে শুনতে পাবে রাজকন্যা? বাবার হাতটি ধরে চলে গেল অন্দর-মহলে। চেয়ে রইল ঝুমরু। তবু চেয়ে দেখল না রাজকন্যা একবারটিও তার দিকে।

ভার হয়ে গেল মনটা ঝুমরুর!

পরেরদিন ডাক পড়ল সর্দারের। ঝুমরুর বাবার। রাজা ডেকেছেন।

কেন?

হাজির হল সর্দার রাজার সামনে।

"তোমার ছেলে এই বয়েসে তো বেশ চালাকচতুর হয়েছে।" রাজা হাসতে হাসতে বললেন।

"আপনার আশীর্বাদে।" উত্তর দিল সর্দার।

"সাহস আছে। কেমন একা একা বেড়িয়ে নিয়ে এল আমার মেয়েকে!"

মাথা নোয়াল সর্দার।

"শোন, আমি ঠিক করেছি রাজ্য জয় করতে বেরুব। তোমার ছেলেকে সঙ্গে নেব।"

"যুদ্ধে!" আঁৎকে উঠল সর্দার। "যুদ্ধে নিয়ে যাবেন? আজ্ঞে ছেলে যে আমার ছোট।" হাত জোড় করল সর্দার।

রাজার মুখের ওপর কথা! রেগে গেলেন রাজা। ধমক দিলেন, "হোক ছোট। সে ভাবনা তোমার নয়। আমি বুঝব। তোমার ছেলের বুদ্ধি আছে। বুদ্ধিকে কাজে লাগাব আমি।"

ভয়ে কাঠ হয়ে গেল সর্দার। আর কথা বলতে পারল না সর্দার রাজার মুখের ওপর। নিঃসাড়ে চলে এল নিজের ঘরে।

আজ সারাদিন কাজ করে নি সর্দার। ভাল লাগছে না। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে বড় ছেলের কথা।

বড় ছেলেটাও যুদ্ধে গেছল রাজার সঙ্গে। সে ফেরে নি। কতদিন কেঁদেছে সর্দার বড় ছেলেটার জন্যে। লুকিয়ে লুকিয়ে। সে-কান্না কেউ শুনতে পায় নি। তারপর ঝুমরুকে চোখে চোখে রেখে বুকে করে মানুষ করেছে। শক্ত লোহার মত গড়ে তুলেছে। এ ছেলেটাও যদি যুদ্ধ থেকে আর না ফেরে কোনদিন? তাহলে কী নিয়ে থাকবে সর্দার? ভাবতে ভাবতে শিউরে ওঠে।

সারাদিন ভেবেছে সর্দার। কী ভেবেছে, কেউ জানে না। রাতে ঘুময় নি সর্দার। জেগে বসেছিল।

ঘুমুচ্ছিল ঝুমরু। নিঃসাড়ে। গভীর রাত যখন আরও নিঃঝুম, ডাক দিল সর্দার ঝুমরুকে। গায়ে হাত দিল। ধড়ফড় করে উঠে পড়ল ঝুমরু। বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল। অবাক হয়ে। ঘুমন্ত চোখে।

ফিসফিস করে বাবা বললে, "চ।"

চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলে ঝুমরু, "কোথা ?"

"চলে যাব এখান থেকে।"

"কেন ?"

"এমনি।"

সত্যি সত্যি চলে গেল সর্দার।

কোথা গেল ?

রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিল। পালিয়ে গেল। পালিয়ে গেল সর্দার ঝুমরুকে নিয়ে রাজবাড়ি থেকে।

খবর হাওয়ার আগে ছোটে। ছড়িয়ে গেল সারা শহরে, সারা রাজ্যে, সর্দার পালিয়েছে।

রাজা হুকুম দিলেন, "যেখান থেকে পার সর্দারকে ধরে আন। পাকড়াও কর।"

গুপ্তচর ছুটল এদিক, ওদিক, চারদিক। সমস্ত রাজ্যটাকে ঘিরে ফেলল তারা। পালাতে পারল না সর্দার। ধরা পড়ে গেল। সর্দারকে বাঁধল। ঝুমরুকে বাঁধল। নিয়ে এল রাজার সামনে।

রাজা হুকুম দিলেন, "সর্দারকে গভীর বনে হাত-পা বেঁধে ফেলে দিয়ে এস।"

রাজার লোকেরা ফেলে দিয়ে এল সর্দারকে গভীর বনে। আর সর্দারের ছেলে ঝুমরু চলল যুদ্ধে রাজার সঙ্গে।

তারপর কতদিন হয়ে গেল। কত বছর কেটে গেছে। শুধু বনে বনে ঘুরেছে সর্দার। খুঁজেছে পথ। বন পেরিয়ে শহরের

পথ। নিঃঝুম বনে শুধু অন্ধকার। ভয়ঙ্কর! সেই বনের অন্ধকারে কত শীত সর্দারের মাথার ওপর দিয়ে চলে গেছে, খেয়াল নেই সর্দারের। কত বসন্ত গাছে গাছে নতুন পাতায় সেজেছে, জানে না সর্দার। কতবর্ষার রিমঝিম মেঘে মেঘে নেচে গেছে, মনে নেই সর্দারের। শুধু ঘুরেছে সর্দার। আর খুঁজেছে।

হঠাৎ আজ আকাশ দেখতে পেয়েছে সর্দার। পথ দেখতে পেয়েছে। বন পেরিয়ে ঐ তো শহরের পথ।

আকাশে আজ কত আলো। কত সোনা। রোদের নাচন লেগেছে। খুশি ছড়িয়ে গেছে গাছের পাতায়। এত প্রজাপতি এল কোথা থেকে? কে দিয়েছে আকাশে উড়িয়ে ওদের? ছড়িয়ে
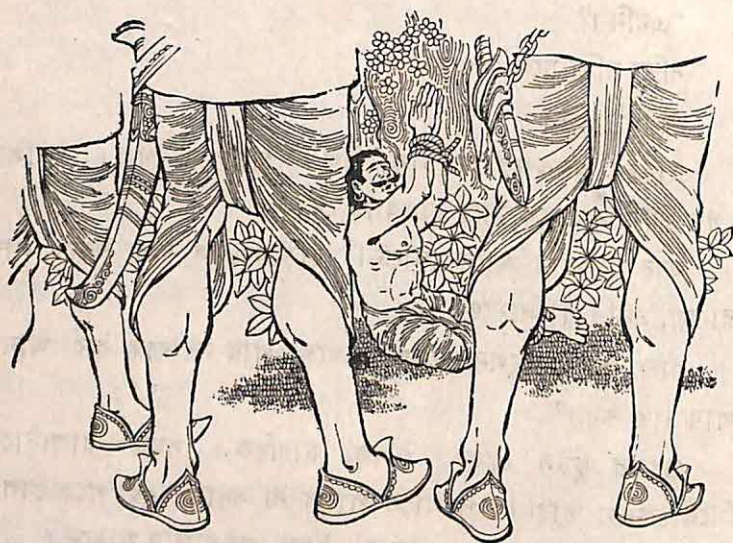
দিয়েছে আলোতে এত রঙ? এত স্বপ্ন? এতদিন চোখ মেলে দেখে নি সর্দার আকাশটা। এতদিন দেখে নি প্রজাপতির পাখায় ছড়ানো রঙের বাহার। আজ ভাল লাগছে তাই দেখতে।

বয়েস হয়েছে সর্দারের। অনেক। এখন আর তেমন করে বুক উঁচিয়ে দাঁড়াতে পারে না। এখন আর তেমন করে শক্ত পায়ে হাঁটতে পারে না। মাথার চুল সব সাদা হয়ে গেছে। ভেঙে

গেছে শরীরটা। অমন লোহার মত দেহটা। চেনা যায় না।

ভাঙবে না? শরীরের আর দোষ কী! কত বছর ধরে শুধু ঘুরেছে। বনে বনে। একা। খুঁজেছে আঁতিপাতি ওর চোখ দুটি। কাকে? ছেলেকে। ঝুমরুকে। চোখে এখনও দেখতে পায়। ক'দিন পরে আর দেখতে পাবে না হয়তো! ক'দিন পরে যদি সর্দার দাঁড়াতে না পারে? না পারে হাঁটতে?

জোরে জোরে পা ফেলল সর্দার।

কিন্তু এ-পথ যে চেনে না সর্দার! এ-পথে সে কোথা যাবে? এ-পথে গেলে তার ছেলেকে সে কি খুঁজে পাবে? ভাবে সর্দার।

তা দশ বছর হয়ে গেছে। যুদ্ধে গেছল ঝুমরু। কে জানে সে ফিরেছে কিনা। সে এখন কেমনটি হয়েছে? চিনতে পারবে তো সর্দার?

পেছনে একটা ঘোড়া আসছে। ইস! দেখ, একেবারে হাড়-জিরজিরে। কোথা ছিল?

হাঁটতে হাঁটতে ঘাড় ফেরাল সর্দার। ঘোড়াটার দিকে দেখল। ঘোড়াটা চলে যাক, মনে ভাবল। সরে দাঁড়াল।

না, ঘোড়াও হাঁটল না। সর্দারের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

দাঁড়ায় কেন?

মনে পড়ল না সর্দারের এ ঘোড়াটাও একদিন রাজবাড়িতে ছিল। বয়েস হয়ে গেছে। তাই ওর ছুটিও হয়ে গেছে। এখন খেতে পায় না। পথে পথে ঘোরে। যত্ন নেই আর একদম। রাজবাড়ির যত্ন।

চিনতে পেরেছে সর্দারকে ঘোড়াটা। তাই দাঁড়াল।

সর্দার একবার দেখল ঘোড়াটার দিকে। আবার হাঁটল।

ঘোড়াও হাঁটল। পিছু পিছু।

সর্দার থামল।

ঘোড়াও থামল।

"আরে!" অবাক লাগল সর্দারের। ঘোড়াটা অমন করে

পিছু নেয় কেন? ঘোড়ার পিঠে হাত দিল সর্দার। ডেকে উঠল ঘোড়া, "চিঁহিঁহিঁ।" ঘাড় নাড়ল। যেন কত খুশি! সর্দারের কি মনে হল, উঠে পড়ল ঘোড়ার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিল ঘোড়া তীর বেগে। কোথা?

রাজবাড়ি।

আহা! আকাশ-ছোঁয়া রাজবাড়ি। এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। এখনও তেমনি ঝকমক করছে। এখনও সিংদরজার দু'পাশে দুই দ্বারী দাঁড়িয়ে। তাদের হাতে তরোয়াল। উঁচিয়ে আছে। এখনও সিংদরজার মাথায় সোনার ঘণ্টা। দুলছে আর বাজছে। কত কথা মনে পড়ছে সর্দারের। হারিয়ে যাওয়া সেই দিনগুলি! চোখ জলে ভরে যায়।

না, না। হঠাৎ খুশিতে বুকখানা ভরে ওঠে সর্দারের। আজ দেখতে পাবে সে তার ছেলেকে। ঝুমরুকে। আঃ, কতদিন! কতদিন পর!

রাজবাড়ির ঠিক সিংদরজার একটু দূরেই দাঁড়াল ঘোড়া। নামল সর্দার।

এত লোক কেন আজ ?

কোথা চলেছে ?

রাজবাড়িতে।

কেন ?

আজ আম-দরবার। রাজা আজ সবার সঙ্গে দেখা করবেন। সবার সঙ্গে কথা বলবেন। সকলের কথা শুনবেন। আজ সবাই যেতে পারবে রাজবাড়ির ভেতরে। দ্বারী আটকাবে না। প্রহরী বকবে না। আজ বাধাও কেউ মানবে না। নতুন নতুন পোশাক পরেছে সবাই। ঝকঝকে। রঙচঙে। কী সুন্দর দেখতে লাগছে! আগে তো এমনি করে দল বেঁধে কেউ রাজবাড়ি আসত না, ভাবে সর্দার।

তবু ওদের সঙ্গে গেলে যদি ছেলেকে দেখতে পায়! দেখতে পায় ঝুমরুকে! বুকটা নেচে উঠল সর্দারের। আনন্দে। মিশে গেল অত লোকের সঙ্গে। হারিয়ে গেল সর্দার ভিড়ের মধ্যে।

সব চেনা সর্দারের। এ-বাড়ির দেওয়ালে যত নকসা, দরবারে যত রঙ, যত আলো, যত ছবি সব চেনে। ঐ তো সোনার সিংহাসন। এখনও ঝলমল করছে।

বসে পড়ল সর্দার দরবারে অত লোকের মাঝখানে।

ঢং ঢং ঢং।

ঘণ্টা বাজল হঠাৎ। চমকে উঠল সর্দার। গমগম করে চেঁচিয়ে উঠল ঘোষক, "রাজা আসছেন।"

শিঙা বেজে উঠল।

নড়ে উঠল সোনার ঝিকিমিকি পর্দা। সরে গেল পর্দার আড়াল। পর্দার আড়াল থেকে রাজা দরবারে পা বাড়ালেন। অতবড় দরবার, অত লোক নিশ্চুপ। চোখ মেলে দেখলে সর্দার রাজার দিকে।

না, এ-রাজা তো চেনা ঠেকছে না! না, না, অচেনাও ঠেকছে না! অবাক লাগল সর্দারের! কে তবে সিংহাসনে বসেছে এখন?

কে রাজা, এ রাজ্যের ?

পাশের লোককে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে সর্দার, "এ কোন রাজা ?"

পাশের লোক আরও চাপা গলায় বললে, "চেন না ?"

"না তো !"

"কোথা থাক তুমি ?"

"ভিন দেশে।"

"এখানে কেন ?"

"তোমাদের রাজাকে দেখতে। এ-রাজার নাম কি ?"

"ঝুমরু।"

"ঝুমরু !" চমকে উঠল সর্দার। থরথর করে হাতের আঙ্গুলগুলো শিউরে উঠল। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল। কথা ফুটল না মুখ দিয়ে। উঠে দাঁড়াতে গেল সর্দার। পারল না।

লোকটা বললে, "অমন করছ কেন ? কি হয়েছে ?"

কাঁপা-কাঁপা গলায় সর্দার বললে, "কিচ্ছু না। আচ্ছা, তোমাদের রাজা কার ছেলে ?"

"জান না ? রাজা আমাদের মাহুতের ছেলে। এর আগে

যিনি রাজা ছিলেন, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গেছলেন আমাদের এই রাজা। হাজার হাজার সেনার সঙ্গে লড়াই করেছেন একা। এমন সহসী মানুষ আর দেখা যায় না। এমন বীর আর হয় না। রাজা তাই যখন স্বগ্গে গেলেন, বিয়ে দিলেন নিজের মেয়ের সঙ্গে মাহুতের ছেলের। আর দিয়ে গেলেন তাঁর গোটা রাজত্ব।"

থাকতে পারল না সর্দার। আদর ঢালা বুকখানা খুশিতে উপচে গেল। আচমকা চেঁচিয়ে উঠল, "ঝুমরু-উ-উ-উ।"

থতমত খেয়ে গেল দরবার চিৎকারে। চমকে চাইল রাজা সেইদিকে। অবাক। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "কে!"

সর্দার নিমেষে উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটি তার জলে ভরে গেছে। আনন্দে, খুশিতে।

রাজা এবার হাঁক দিল, "কে?"

দরবার কেঁপে উঠল।

কেঁপে উঠল দরবারের যত লোক। একসঙ্গে ডেকে উঠল, "কে? কে? কে?"

"বাবা!" হঠাৎ চিনতে পেরেছে ঝুমরু। দেখতে পেয়েছে তার বাবাকে। লাফিয়ে উঠল ঝুমরু। ছুটে এল সেইদিকে।

না, সর্দারও দাঁড়াল না। ছুট দিল। দরবারের অত লোকের ভিড় ঠেলে ছুট দিল। হঠাৎ কোথা থেকে এত শক্তি পেল সর্দার?

ছুট দিল সর্দার দরবার থেকে। না, এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা নয়। ছেলেকে সে দেখেছে। ঝুমরু তার রাজা হয়েছে। সমস্ত বুকখানা তার খুশির আলোয় ভরে গেছে। আর কী দরকার তার এ-রাজবাড়িতে। সে যে মাহুত! আজ সর্দারের ছুটির দিন। ছুটি, ছুটি, ছুটি।

কিন্তু কেমন করে ছুটি দেবে ঝুমরু, তার বাবাকে?

"বাবা-আ-আ-আ।" সে ডাক দিল। সে ছুটল। ঐ পা দুটি সে জড়িয়ে ধরবে বাবার।

অতবড় দরবার থমকে গেল।

অত লোক চমকে গেল।

না, কেউ ধরতে পারল না সর্দারকে। ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে পড়েছে সর্দার দরবার থেকে। বেরিয়ে পড়েছে রাজবাড়ির বাইরে।

তখনও দাঁড়িয়েছিল ঘোড়াটা। সেই হাড়-জিরজিরে ঘোড়াটা বাইরে। লাফ দিল সর্দার ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া ছুট দিল। জোড় কদম।

সঙ্গে সঙ্গে রাজাও ছুটল ঘোড়ার পিঠে। রাজার সঙ্গে সিপাই ছুটল।

না, পারল না। পারল না ঝুমরু বাবার কাছে পৌঁছতে। হাড়-জিরজিরে ঘোড়া অনেক আগে ছুটছে। পিঠে তার সর্দার।

অনেক আগে।

অনেক দূর।

আরও দূরে চলে গেল ঘোড়া। তীরের মত ছোটে সে।

একটু একটু করে মিলিয়ে গেল। একটু একটু করে হারিয়ে গেল ঐ পাহাড়ের আড়ালে।

ঝুমরুর চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এসেছে। ওর চোখ দুটি আর খুঁজে পাচ্ছে না বাবাকে। ওর চোখ দুটি ভেসে গেল কান্নায়।

সর্দার আর ফিরবে না। আজ যে আলো দেখতে পেয়েছে সর্দার। সামনে শুধু আলো। আলো আর রঙ। ছেলে তার রাজা হয়েছে। এ স্বপ্ন তো সে কোনদিন দেখে নি। আজ শুধু খোলা আকাশের নিচে বুক ভরা খুশি নিয়ে ঘুরে বেড়াবে সর্দার। ফিরবে না আর।

ফিরে এল ঝুমরু। ফিরে এল যে-পথে ওর বাবা চলে গেল সে-পথ দিয়ে।

কতদিন হয়ে গেছে। এখনও চেয়ে থাকে ঝুমরু ঐ পথের দিকে। রোজ। ঐ পথের দুপাশে সবুজ গাছের ছায়ায় পাখিরা ডাকে। হাজার হাজার ফুল রঙে রঙে ভরে যায়। ঐ পথ

সোনা-রূপায় মুড়ে দিয়েছে ঝুমরু। ও ভাবে, একদিন ওর বাবা ফিরবে।

হয়তো ফিরবে। হয়তো ওকে আবার তেমনি বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবে। আদর করবে। তেমনি আবার গল্প বলবে। বলবে, অভিমন্যু-বীরের গল্প। রাম আর লব-কুশের গল্প।

আর?

আর বলবে মায়ের গল্প। মা! মনে নেই ঝুমরুর মাকে। বাবার মুখে গল্প শুনতে শুনতে ও যেন দেখতে পায় মাকে। মায়ের মুখখানি। চোখ দুটি। আদর-ছোঁয়া হাত দুটি।

হোক সে রাজা। কিন্তু বাবার কাছে সে তো ঝুমরু। নিঃঝুম ঘরে একটি প্রদীপ জ্বালবে ঝুমরু। অন্ধকার আবছা-আবছা! সে-ঘরে কেউ থাকবে না। শুধু বাবার বুকে মাথা রেখে গল্প শুনবে ঝুমরু। বাবা কী সুন্দর গল্প বলতে পারে!

তাই রোজ সকালে যে-ফুলটি প্রথম ফোটে সবুজ গাছে, সে-ফুলটি তুলে নেয় ঝুমরু। ঐ পথে তার পাপড়িগুলি ছড়িয়ে দেয় আর কাঁদে, "বাবা, তুমি ফিরে এস, ফিরে এস।"

সে-কান্না কেউ শুনতে পায় না। কেউ না।

বেড়াল-বাঁদর-গাধা আর লোকটা

অবাক-অবাক দেখতে একটা লোক।
লোকটা না-জোয়ান। না-বুড়ো।
না-বেঁটে। না-ঢ্যাঙা।
না-মোটা। না-রোগা।
শুধু অবাক-অবাক।
তার ছিল একটা বেড়াল। ঢুলু-ঢুলু।
একটা বাঁদর। ভুলু-ভুলু।
একটা গাধা। হাঁদা-হাঁদা।
ঢুলু-ঢুলু বেড়ালটা দিনেরবেলা ঢুলত।
ভুলু-ভুলু বাঁদরটা দিনরাত্তির এটা ওটা ভুলত।
হাঁদা-হাঁদা গাধাটা হেঁড়ে-হেঁড়ে গলায় রাতদুপুরে গান গাইত।
লোকটাও তেমনি! রোদ উঠলে হাই উঠত, হা-উ-উ-উ।
মেঘ দেখলে হাসি পেত, হ্যা-হ্যা-হ্যা।
চাঁদ দেখলে গান গাইত, গা-মা-পা-ধা।
লোকটার চাল ছিল না।

চুলো ছিল না

বউ ছিল না।

ছেলে ছিল না।

তার শুধু বেড়াল ছিল একটা।

বাঁদর ছিল একটা।

গাধা ছিল একটা।

একটা ছেঁড়া-ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি। বিচ্ছিরি ময়লা। তার মধ্যে যত রাজ্যির সম্পত্তি তার। পুঁটলিটা পিঠে বাঁধত। বেঁধে, গাধার পিঠে সুড়ুৎ করে উঠে পড়ত। অমনি তিড়িং করে লাফিয়ে বসত বেড়ালটা লোকটার কোলে। সাঁই-ই করে লাফিয়ে উঠত বাঁদরটা লোকটার মাথায়। তারপর গাধাটা হাঁটতে সুরু করত।

গাধাটা হাঁটত। পথ চলত। আর ঢুলত।

ঢুলত লোকটা গাধাটার পিঠে।

ঢুলত বলে কোলে বসে বসে বেড়ালটা ঢুলত।

বাঁদরটা মাথা নেড়ে নেড়ে উকুন বাছত।

আর লোকটা? থেকে থেকে হাই তুলত।

গাধাটা হাঁটতে হাঁটতে যখন আর থামত না, লোকটা চেঁচাত, "থাম যা।"

অমনি গাধাটা দাঁড়িয়ে পড়ত।

বেড়ালটা ঘুমুতে ঘুমুতে যখন উঠত না, লোকটা ডাকত, "উঠ যা।"

অমনি বেড়ালটা উঠে পড়ত।

বাঁদরটা মাথার উকুন বাছতে বাছতে যখন নামত না, লোকটা হাঁকত, "নাম যা।"

অমনি বাঁদরটা লাফিয়ে পড়ত।

বাঁদরটা লাফালে লোকটা গাধার পিঠ থেকে সুড়ুৎ করে নেমে পড়ত।

বেড়ালটা লোকটার কোল থেকে ঝাপাং করে ঝাঁপিয়ে পড়ত।

গাধাটা হেঁড়ে গলায় ডেকে উঠত।

তারপর?

বেড়ালটা যে-বাড়িটা সামনে দেখত, সে-বাড়িটায় ঢুকে পড়ত।

বাঁদরটা যে-গাছটা নিচু দেখত, সে-গাছটায় উঠে পড়ত।

লোকটা হেঁজি-পেঁজি ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলিটা পিঠ থেকে খুলত। মাটিতে রাখত। একটা ভাঙা ঘটি বার করে, ঘটি ভর্তি জল এনে চোখে দিত, মুখে দিত। গাধাটা ততক্ষণে সামনের মাঠে চড়তে চড়তে কচি কচি ঘাস চিবুত।

গাধাটা ঘাস চিবুচ্ছে মাঠে মাঠে।

বেড়ালটা দুধ চাটছে বাটি বাটি।

বাঁদরটা কলা খাচ্ছে গাছে গাছে।

আর লোকটা তখন গণেশঠাকুরের পুজো করছে।

পুজো সেরে চিঁড়ে-মুড়কির ফলার খাবে। ফলার খেয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। চাঁদ উঠবে কখন? চাঁদ উঠলে গান গাইবে।

লোকটা আকাশের দিকে দেখত বলে, বাঁদরটাও চাইত।

বাঁদরটা চাইত বলে, বেড়ালটাও তাকাত।

বেড়ালটা তাকাত বলে, গাধাটাও চোখ মেলত।

তারপর চাঁদ উঠত।

গান গাইত লোকটা।

তাই শুনে হেঁড়ে-গলায় সুর ভাঁজত গাধাটা। আর বাঁদরের গলা জড়িয়ে বেড়ালটা, বেড়ালের গলা জড়িয়ে বাঁদরটা নাচ লাগাত, তাক-ধিনা-ধিন, তাক-ধিনা-ধিন।

গাইতে গাইতে, নাচতে নাচতে, চাঁদের আলো ফুরিয়ে ফুরিয়ে যাবে। তারার আলো নিভে নিভে আসবে তখন ঘুমিয়ে পড়বে লোকটা। ঘুম ভাঙলে আবার হাঁটবে।

হাঁটতে হাঁটতে একদিন হয়তো নাম-না-জানা গ্রামে গেল। অচেনা এক গঞ্জে গেল। অজানা এক নগরে গেল। কোথায় যাবে

তার তো ঠিক নেই। যেদিকে চোখ যায়।

এমনি করে একদিন একটা শহরে পৌঁছল। শহরের লোক তো আর এমন আজগুবি কাণ্ড দেখে নি কোনদিন! কীরে বাবা! একটা লোক বসেছে গাধার পিঠে! কোলের ওপর মেনি-বেড়াল! মাথায় বসে পোষা বাঁদর! যে দেখে, সে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে।

দেখতে দেখতে লোক জমল।

প্রথমে জমল একটি একটি মানুষ। একটু একটু হাসি, হি-হি-হি।

তারপর দুটি দুটি মানুষ। হ্যা-হ্যা-হ্যা হাসি।

তারপর দশটি দশটি।

একশোটি একশোটি।

হাজারটি হাজারটি।

হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল হ্যা-হ্যা, হো-হো, হি-হি, হু-হু। চারিদিকে হাসি আর হাসি। হৈ-হৈ ব্যাপার। এ-মোড়, ও-মোড় যে-দিকে চাও লোকে লোকারণ্য! তারা হাসছে, হাসছে, হাসছে।

লোক তো লোক বয়েই গেছে। হাঁদা-হাঁদা গাধাটা হাঁটছে তো, থামছে না।

বোকা-বোকা লোকটা দুলছে তো, দেখছে না।

ঢুলু-ঢুলু বেড়ালটা ঢুলছে তো, জাগছে না।

বাঁদরটা আনমনে লোকটার কাঁধে বসে উকুন বাচছে আর গালে পুরছে। মাঝে মাঝে ল্যাজ ঝুলিয়ে বেড়ালের নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

লোকে লোকে পথ আটকে গেল।

পথ আটকে গেল বলে, গাড়ি রুখতে হল।

গাড়ি নেই, তাই বাজার বসল না।

বাজার ফাঁকা, তাই রান্না চড়ল না।

রান্না নেই, তাই খাওয়া জুটল না।

খাওয়া বন্ধ।

খাস-কাছারি বন্ধ।

দোকান-পাট বন্ধ।

টাকা লেন-দেন বন্ধ।

পড়াশোনা বন্ধ।

পাঠশালাও বন্ধ।

গাড়ি যখন চলল না,

বাজার যখন বসল না,

দোকান-পাট খুলল না,

রান্না যখন চড়ল না,

পড়ার ঘণ্টা পড়ল না,

তখন ?

এক কাণ্ড হল। হল কী, কোথায় ছিল একটা ছোট্ট ছেলে। ছুটতে ছুটতে ঠেলেমেলে গাধাটার কাছে হাজির। গাধার ল্যাজটা ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "হুড়-ড়-ড়।" আচমকা। মারলে ল্যাজে হ্যাঁচকা টান। ব্যস! গাধা ছুটতে আরম্ভ করলে। বাসরে বাস! সে কী ছুট! ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে। ঠ্যাং তুলে তুলে লাফ মারছে। লোকে ভয় পেয়ে গেল।

গাধা ছুটছে,

লোক পালাচ্ছে।

গাধা হাঁকছে,

লোক কাঁপছে।

গাধা ডাইনে ছুটল। ডানদিকের লোক হুড়মুড়িয়ে ছুটে যায়।

গাধা বাঁয়ে লাফায়। বাঁদিকের লোক হুড়দাড়িয়ে পালিয়ে যায়।

সামনে খাঁ-খাঁ

পেছন ফাঁকা।

একটু একটু দরজা ফাঁক, উঁকি ঝুঁকি।

একটু একটু জানলা চাপা, চুপি চুপি

মা দেখছে

বাবা দেখছে

পিসি দেখছে

ছেলে দেখছে

মেয়ে দেখছে।

দেখছে, গাধা ছুটছে আর চেঁচাচ্ছে।

ছুটছে তো! কিন্তু লোকটার তো কিছুই হয় নি। সে তো তেমনিই বসে আছে গাধার পিঠে। তেমনি মাথায় বাঁদরটা। তেমনি কোলে বেড়ালটা। বেড়ে মজা তো!

ছুটতে ছুটতে গাধাটা যখন শহরের মাঝামাঝি এসেছে তখন সামনে একটা মস্তবাড়ি। মস্তবাড়ি, রাজবাড়ি। মস্তবাড়ির মস্ত দরজা, সিংদরজা। গাধাটা দেখলেই না। দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সামনে দ্বারী। রুখতে এল। গাধা মারলে ঢুঁ। দ্বারী ছিটকে গেল।

পেছনে দ্বারী। বাঁধতে এল। গাধা মারলে ঠ্যাং। দ্বারী চিৎপটাং।

ছুটল গাধা। পাঁই পাঁই।

ডাকল গাধা, "ঘ্যাঙকু-উ-উ, ঘ্যাঙকু-উ-উ।"

কান ঝালাপালা।

কান ঝালাপালা তাই মস্তবাড়ির হাজার ঘোড়া চিঁ-হিঁ-হিঁ করে ডেকে উঠল।

মস্তবাড়ির মস্ত মস্ত থামগুলো কেঁপে উঠল। দরদালান গমগম করে উঠল।

বাসন-কোসন ঝন-ঝন-ঝন পড়ল।

ঝি-দাসীরা ধড়-ফড়-ফড় ছুটল।

ঘরের দরজা ত্বম-ত্বম-ত্বম ভাঙল।

তখন মস্তবাড়ির মস্ত রাজা চমকে উঠলেন। বললেন, "কী ব্যাপার! এত চেঁচামেচি কিসের!"

মস্তবাড়ির মস্ত রাজা ওপর থেকে নিচের দিকে তাকালেন। রাজা তো থ! রাজবাড়ির ভেতর একী কাণ্ড! রাজবাড়িতে গাধা ছুটছে!

গাধার পিঠে লোক দুলছে!

লোকের কোলে মেনি ঢুলছে!

মাথায় বসে বাঁদর ঝুলছে!

সিপাই ছুটছে পিছু পিছু, ধরতে। পারছে না।

ঘোড়া ডাকছে, চিঁহিঁ চিঁহিঁ, নাচছে। থামছে না।

গাধা হাঁকছে, ঘ্যাঙকু, ঘ্যাঙকু, ছুটছে। রুখছে না।

বাড়ি বলে বাড়ি, রাজবাড়ি। সেখানে একী কাণ্ড! এ কী ধাপার মাঠ, না চিড়িয়াখানা! রাজা বুঝি রাগলেন! এই বুঝি হাঁকলেন!

না, রাজা চটলেন না। হাঁকলেন না। ঘাবড়ে গিয়ে লুকিয়ে ঘরে ছুটলেন না। রাজা একটি ফুল ছিঁড়ে নিলেন ফুলদানি থেকে চট করে। ছুঁড়ে দিলেন ওপর থেকে গাধার দিকে। একেবারে নাকের ডগায়।

ওমা! একী! হঠাৎ গাধা থামল যে!

ফুল-ফুল-ফুল, ভুরু ভুরু গন্ধ। গাধার নাকে সেঁদুল। আহা!

ফুল-ফুল-ফুল, গোলাপ-গোলাপ রাঙা। গাধার চোখে রঙ ছড়াল। ওহো!

ফুলের গন্ধে, ফুলের রঙে অমন যে গাধা একেবারে কাদা। সে ছুটছেও না, হাঁটছেও না। নাচছেও না, ডাকছেও না। থ হয়ে গেল গাধা। এমন সময় আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন রাজা, "ধর।" বাবা! যেন বাজ পড়ল!

সিপাইরা চমকে উঠে থমকে গেল। একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল

গাধাটার ওপর।

গাধাটা নড়তেও পারে না, চড়তেও পারে না।

যখন

গাধাটা নড়তে পারল না, রাজা তখন হুকুম দিলেন, "বাঁদরটার ল্যাজ ধর।"

একটা না ছুটো সেপাই বাঁদরটার ল্যাজ ধরে টান দিলে। বাঁদরটা পালাতে পারল না।

যখন

গাধাটা নড়তে পারল না,

বাঁদরটা পালাতে পারল না,

রাজা তখন হুকুম দিলেন, "বেড়ালটার ঠ্যাং ধর।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনটে না চারটে সেপাই বেড়ালটার ঠ্যাং ধরলে। বেড়ালটা "ম্যাও" করতে পারল না।

যখন

গাধাটা নড়তে পারল না,

বাঁদরটা পালাতে পারল না,

বেড়ালটা ম্যাও করল না,

রাজা তখন হাঁক পাড়লেন, "লোকটার কান পাকড়াও।"

পাঁচটা না ছটা সেপাই লোকটার কান ধরলে। হিড়হিড় করে টান দিলে। লোকটা কিচ্ছু বললে না।

যখন

গাধাটা নড়তে পারল না,

বাঁদরটা পালাতে পারল না,

বেড়ালটা ম্যাও করল না,

লোকটা রা কাড়ল না,

তখন রাজা বললেন, "গাধার কান ছিঁড়ে দাও। বাঁদরের ল্যাজ কেটে দাও। বেড়ালের ঠ্যাং ভেঙে দাও। লোকটার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢাল। গাধার পিঠে চাপিয়ে শহর থেকে বার করে দাও।"

তারপর গাধার কান ছেঁড়া গেল।

বাঁদরের ল্যাজ কাটা পড়ল।

বেড়ালের ঠ্যাং ভাঙা গেল।

লোকটার মাথা নেড়া হল।

রাজবাড়ির সেনারা লোকটাকে গাধার পিঠে চাপালে। নেড়া মাথায় ঘোল ঢাললে। কান ধরে টানতে টানতে শহর থেকে বার করে দিলে। শহরের হাজার হাজার লোক তাই দেখে হেসে গড়িয়ে কুটোকুটি। ইস! কী লজ্জা!

গাধার কান ছিঁড়ল বলে, গাধা একবারও উঃ, উঃ, করল না।

বাঁদরের ল্যাজ কাটল বলে, বাঁদর একটুও আঃ, আঃ, ডাকল না।

বেড়ালের ঠ্যাং ভাঙল বলে, বেড়াল মাঃ, মাঃ, কাঁদল না।

বাঁদর বললে, "বেড়ালরে বেড়াল, কী অপমান!"

বেড়াল বললে, "গাধারে গাধা, মান ইজ্জত গেল।"

গাধা বললে, "বেড়ালরে বেড়াল, অপমানের শোধ নিতে হবে।"

"কেমন করে?" জিজ্ঞেস করলে বেড়ালটা।

"কেমন করে?" অবাক হল বাঁদরটা।

"কেমন করে? ভাবতে হবে।" উত্তর দিলে গাধাটা।

ন্যাড়া মাথা লোকটা কিন্তু চুপচাপ। মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। কখন চাঁদ উঠবে? গান গাইবে।

আর?

বাঁদরটা,

গাধাটা,

বেড়ালটা,

ভাবতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে যেদিন চাঁদ উঠল না, তারা ফুটল না, আকাশে মেঘ-মেঘ করল, মেঘ দেখে ন্যাড়া মাথা লোকটা খিলখিল করে হেসে উঠল, সেদিন বাঁদরের কাটা-কাটা ল্যাজের ব্যথা মরল।

যেদিন আকাশে মেঘ করল, কালো মেঘ গুড়গুড় করে ডাকল, খুব বিষ্টি পড়ল, সেদিন বেড়ালের ভাঙা-ভাঙা ঠ্যাং জোড়া লাগল।

যেদিন খুব বিষ্টি পড়ল, জল থৈথৈ মাঠ ভেসে গেল, মাঠে মাঠে সবুজ ধানে ভরে গেল, সেদিন ন্যাড়া-ন্যাড়া লোকটার মাথায় চুল গজাল।

যেদিন সবুজ ধান রোদের ছোঁয়ায় সোনা হল, সোনার ধান মাঠে মাঠে কাটা হল, কাটা ধান ঘরে উঠল, সেদিন গাধার ছেঁড়া-ছেঁড়া কানের ঘা শুকাল।

তখন আবার লোকটা গাধার পিঠে বসল,

বেড়ালটা লোকের কোলে ঢুলল,

বাঁদরটা ঘাড়ের ওপর ঝুলল,

গাধাটা হাঁটতে সুরু করল।

হাঁটছে গাধাটা।

ভাবছে বাঁদরটা।

ভাবছে বেড়ালটা।

ভাবছে গাধাটা।

ভাবছে শোধ নেওয়া যায় কেমন করে? অপমানের?

ওমা! হঠাৎ এ কোথায় এল তারা হাঁটতে হাঁটতে? এ তো বনও নয়, বাদাড়ও নয়! শহরও নয়, নগরও নয়! গ্রামও নয়, গঞ্জও নয়! পাহাড়ও নয়, মরুও নয়!

আলো নেই

আঁধি নেই

হাওয়া নেই

পাখি নেই

গান নেই

হাসি নেই

বলা নেই

কওয়া নেই।

গাছেরা বাড়ে না।

পাতারা ঝরে না।

টিকটিকি হাঁচে না।

মানুষে কাশে না।

না ঝমঝম।

না গমগম।

"ঝুন-ঝুন-ঝুন," হঠাৎ যেন কী বেজে উঠল! পায়ে ঠেকল গাধাটার! ছিটকে গেল! কী ওটা?

লোকটা বললে, "কী ওটা?"

গাধাটা হাঁকলে, "কী ওটা?"

বাঁদরটা নাচলে, "কী ওটা?"

বেড়ালটা ডাকলে, "কী ওটা?"

ঝকঝকে!

তকতকে!

ঝুনঝুন!

টুনটুন!

বাঁদরটা লাফ দিলে।

বেড়ালটা তাক দিলে।

লোকটা হাত দিলে।

দেখো! দেখো! একটা সোনার ঘণ্টা! রাস্তায় পড়ে! তুলে নিল লোকটা। বাজাল, টুনটুন।

বাঁদরটা চেয়ে রইল। যেন বললে, আমার গলায় পরিয়ে দাও।

বেড়ালটা তাকিয়ে রইল। যেন চাইল, আমার গলায় বাজিয়ে দাও।

গাধাটা ঠ্যাং ছুঁড়ল। মন বলল, আমার গলায় সাজিয়ে দাও।

বেশ, বেশ। সব্বাই পরবে। বাঁদর আজ পরবে। কাল পরবে বেড়াল। পরশু সাজবে গাধা। একসঙ্গে কি সবাই পরতে পারে? ঘণ্টা তো একটা!

সেই বেশ।

তাই আজ কে পরবে? কে পরবে?

বাঁদর পরবে।

লোকটা বাঁদরের গলায় সোনার ঘণ্টা পরিয়ে দিল। ঘণ্টা বাজিয়ে দিল, টুং টাং।

ওমা! সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার! চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল! ঘুরঘুট্টি অন্ধকার! যতক্ষণ ঘণ্টা বাজে ততক্ষণ অন্ধকার!

তারপর?

বাজতে বাজতে ঘণ্টার বাজনা যখন থেমে এল, আস্তে আস্তে আলো তখন নেমে এল।

একটু আলো,

আর একটু,

আরও একটু!

থেমে গেছে ঘণ্টার বাজনা। ব্যস! আঁধারও কেটে গেছে। আলোয় আলোয় ভরে গেছে আবার। লোকটার চোখে আবার আলো ছড়িয়ে পড়ল।

ওমা! একী! লোকটা চমকে উঠে অবাক!

ওমা! ও কী! গাধাটা চেঁচিয়ে উঠে হাঁদা!

ওমা! উ কী! বেড়ালটা লাফিয়ে উঠে বেবাক!

সব্বনাশ! বাঁদর ছিল একটা। হয়ে গেছে দুটো!

কেমন করে?

ঘণ্টা পরে?

সঙ্গে সঙ্গে বাঁদরটা নিজের গলার ঘণ্টা খুলে ছুট্টে এল। বেড়ালটার গলায় পরিয়ে দিল। টুং টাং!

দেখো! দেখো! দেখো! একটা বেড়াল দুটো হয়ে গেছে!

সঙ্গে সঙ্গে বেড়ালটা ছুট্টে এল। নিজের গলার ঘণ্টা খুলল, গাধার গলায় পরিয়ে দিল। টুং টাং!

হ্যাঁ ঠিক তাই! একটা গাধা দুটো হয়ে গেছে!

কী কাণ্ড!

কাঁপতে লাগল লোকটা দেখে-শুনে। থুপ করে বসে পড়ল মাটিতে কাঁপতে কাঁপতে। তাড়াতাড়ি হেঁজিপেঁজি পুঁটলিটা খুলে ফেললে। গণেশঠাকুর বার করলে। ঠাকুরের সামনে বসে, আকাশের দিকে চোখ তুলে, হরিনামের মালা জপতে সুরু করে দিলে।

বাঁদরটার মাথায় সঙ্গে সঙ্গে একটা বুদ্ধি এসে গেল। ছুটে গেল গাধার কাছে ঘণ্টা নিয়ে। পরিয়ে দিল গাধার গলায় ঘণ্টা। একবার, দুবার, তিনবার, বারবার!

একটা-একটা গাধা দুটো-দুটো হয়ে গেল।

দুটো-দুটো গাধা চারটে-চারটে,

আটটা-আটটা,

দশটা-দশটা,

একশো-দুশো,

পাঁচশো-ছ'শো,

পাঁচহাজার-ছ'হাজার,

হাজার-হাজার,

অগুনতি গাধা।

মাঠে গাধা। ঘাটে গাধা। উঠনে গাধা। ছাতে গাধা। উপচে গেল। যেদিকে চাও গাধা।

অগুনতি গাধা ছুট দিল।

বাঁদরটা এবার বেড়ালের গলায় ঘণ্টা পরায়।

একটা বেড়াল দুটো হয় আর গাধার পিছু ছুটতে থাকে।

ছুটছে। ছুটছে। অগুনতি গাধার পেছনে অগুনতি বেড়াল।

তারপর বাঁদরটা নিজের গলায় ঘণ্টা পরে।

একটা বাঁদর দুটো হয়, আর বেড়ালের পিছু লাফ মারে।

অগুনতি গাধার পেছনে অগুনতি বেড়াল। ছুটছে।

অগুনতি বেড়ালের সঙ্গে অগুনতি বাঁদর। লাফাচ্ছে।

কোথা চলেছে ছুটতে ছুটতে? লাফাতে লাফাতে?

শহরে চলেছে।

কোন শহরে!

সেই শহরে। মস্ত রাজার মস্তবাড়িতে।

লোকটা কিন্তু কোনদিকেই চাইছে না। হরিনামের মালাই জপছে।

যেদিকে চাও, খালি গাধা-গাধা-গাধা, বেড়াল-বেড়াল-বেড়াল, বাঁদর-বাঁদর-বাঁদর।

ছুটছে!

গাধা-গাধা-গাধা,

বেড়াল-বেড়াল-বেড়াল,

বাঁদর-বাঁদর-বাঁদর,

পাহাড়ে উঠল। পাহাড় ধসে গেল।

নদীতে লাফাল। নদী বুজে গেল।

ক্ষেত-খামারে ছুটল। ফসল ফুরিয়ে গেল।

শেষকালে সেই শহর এল।

অমনি গাধা চেঁচিয়ে ডাকে, "ঘ্যাঙকু, ঘ্যাঙকু।" লক্ষ লক্ষ গাধার হেঁড়ে হেঁড়ে ডাক। কেঁপে কেঁপে ওঠে বাড়িগুলো, ঘর-দোর। ভেঙে ভেঙে পড়ল। বড় বড় দোকান-পাট ধুলো-ধুলো হয়ে গেল। বড় বড় রাস্তা-ঘাট খানা-ডোবায় ভরে গেল।

গাধা-গাধা-গাধা,

বেড়াল-বেড়াল-বেড়াল,

বাঁদর-বাঁদর-বাঁদর,

ছুটতে ছুটতে রাজবাড়ির সামনে।

রাজা তো ভয়ে জুজুবুড়ি! রাজবাড়ির সিংদরজা ঘড়-ঘড়-ঘড় বন্ধ হল।

হলে কি হবে?

অমনি লাখ লাখ বাঁদর লাফ দিলে। রাজবাড়ির এখানে-ওখানে, বাগানে-উঠানে চেঁচামেচি, নাচানাচি লাগিয়ে দিলে।

বাঁদরের ল্যাজ ধরে বেড়ালগুলোও উঠে পড়ল তরতর করে। এ-ঘরে, ও-ঘরে, সে-ঘরে সেঁদিয়ে পড়ল।

লাখ লাখ গাধা সিংদরজায় ঘা মারলে। সিংদরজা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

রাজবাড়ির যত ঘোড়া চিঁহি, চিঁহি ডেকে উঠল। যত হাতি

থুপথাপ, থুপথাপ দৌড় মারল। যত উট চোঁ-চা, চোঁ-চা ছুট মারল।

পালা, পালা, পালা।

রাজবাড়ির সিপাই-সেনা ছুটে এল। এক লাখ বাঁদর এক সঙ্গে চটাপট, চটাপট চড় মারলে তাদের গালে। এক লাখ গাধা খটাখট, খটাখট মাড়িয়ে দিল তাদের।

এক লাখ বেড়াল তাদের গোঁফে কামড়ে দিলে। দাড়ি খামচে উপড়ে ফেললে।

রাজা তখন অন্ধকার ঘরে বসে চুপটি করে কাঁপছেন! ভয়ে!

গাধা-গাধা-গাধা,

বেড়াল-বেড়াল-বেড়াল,

বাঁদর-বাঁদর-বাঁদর,

রাজবাড়ি তছনছ করে রাজাকে খুঁজতে লাগল।

খুঁজতে খুঁজতে অন্ধকার ঘর। অন্ধকারে বেড়ালের চোখ জ্বলজ্বল। জ্বলজ্বলে চোখ দেখেই রাজা চমকে গেলেন। চেঁচিয়ে উঠলেন, "বাপরে! মারে!"

পড়ি-মরি ছুট দিলেন রাজা ঘর থেকে বাইরে। ব্যস! অমনি কোথায় ছিল বাঁদর, দৌড়ে এসে ঘাড়ে চাপল। রাজার নাক কামড়ে দিলে। কান কেটে ফেললে। মাথার মুকুট কেড়ে নিলে। নাক-কান-কাটা রাজা বাঁদরকে ঘাড়ে নিয়েই মারলেন লাফ। ওপর থেকে নিচে। মারলেন দৌড়। ঘর থেকে বাইরে।

অমনি পেছন-পেছন ছুটল

গাধা-গাধা-গাধা,

বাঁদর-বাঁদর-বাঁদর,

বেড়াল-বেড়াল-বেড়াল।

রাজাও ছুটছেন।

রাজার সামনে-সামনে ঘোড়া,

পেছন-পেছন হাতি,

তার পেছন উট,
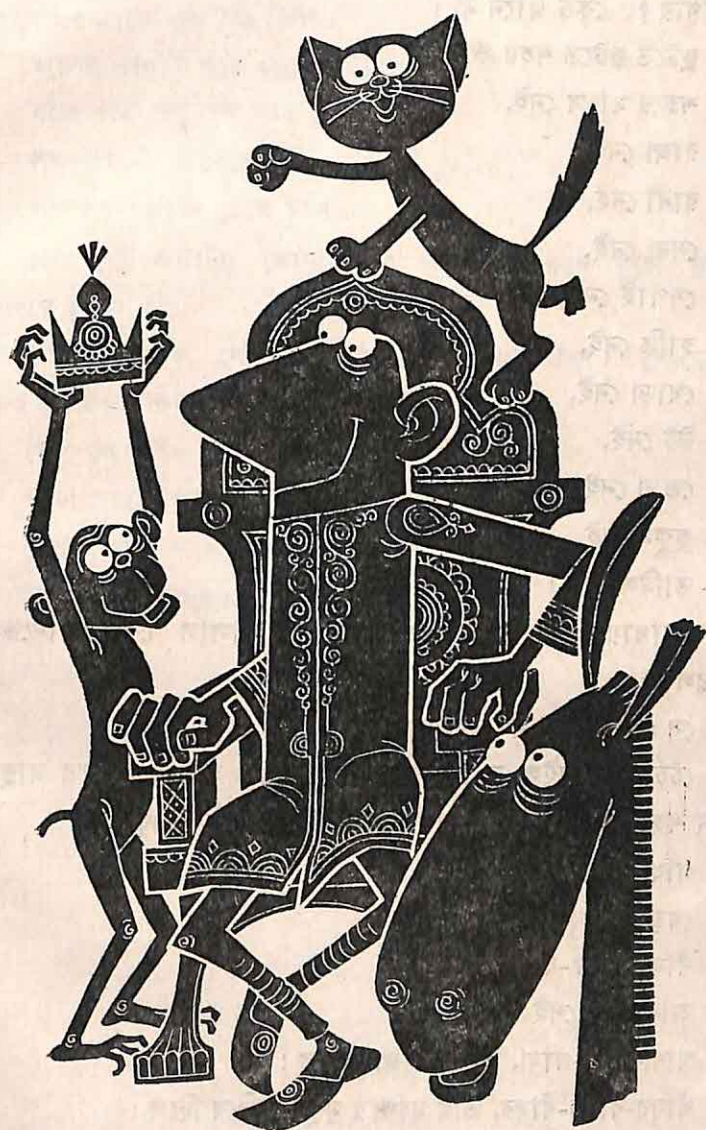
উটের পিছু সেপাই।

তাই দেখে শহরের মানুষও ছুটছে। ভয়ে। ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে কোথায়? কেউ জানে না।

ছুটতে ছুটতে শহর ফাঁকা।

শহরে মানুষ নেই,

রাজা নেই,

রানী নেই,

সেনা নেই,

সেপাই নেই,

হাতি নেই,

ঘোড়া নেই,

উট নেই,

ভেড়া নেই,

হুকুম নেই,

তামিল নেই।

কোথায় যে তাড়া খেয়ে তারা পালাল কেউ জানতেও পারল না।

সে দেশে রাজা যখন রইল না,

চেঁচামেচি রইল না। সব যখন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, সব মানুষ যখন শহর ছেড়ে পালিয়ে গেল, তখন সে দেশে রইল শুধু :

গাধা-গাধা-গাধা,

বেড়াল-বেড়াল-বেড়াল,

বাঁদর-বাঁদর-বাঁদর।

আর রইল সেই লোকটা।

গাধা-গাধা-গাধা, তাকে রাজা করলে।

বাঁদর-বাঁদর-বাঁদর, তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দিলে।

বেড়াল-বেড়াল-বেড়াল, তাকে সিংহাসনে বসালে।

লোকটা রাজ-পোষাক পরে, মাথায় মুকুট দিয়ে সিংহাসনে বসল।

অমনি আসল বেড়ালটা তার কোলের ওপর লাফিয়ে বসল।

আসল বাঁদরটা তার ঘাড়ে লাফিয়ে উঠল। ল্যাজ ঝুলিয়ে বেড়ালের নাকে সুড়সুড়ি দিলে।

আসল গাধাটা গান ধরলে, "গা-মা-পা-ধা।"

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ গাধা গেয়ে উঠল।

লক্ষ লক্ষ বাঁদর নেচে উঠল।

লক্ষ লক্ষ বেড়াল হেসে উঠল।

আর সেই ঘণ্টাটা, সোনা-সোনা ঘণ্টা, টুংটুং করে দুলে দুলে বাজতে লাগল।

সেইদিন থেকে, সেই লোকটা, সেই দেশের রাজা। সে-দেশে কিন্তু একটিও মানুষ নেই।

সে-দেশে আছে

গাধা-গাধা-গাধা,

বেড়াল-বেড়াল-বেড়াল,

বাঁদর-বাঁদর-বাঁদর।

চাঁদ আর পাপুই

তার নাম পাপুই। ছোট্ট একটি মেয়ে।

কী মিষ্টি গান গায় পাপুই! পাখির মিষ্টি গানের সব সুর, কে যেন ঢেলে দিয়েছে পাপুই-এর গলায়। ভোমরার মিষ্টি সুরের গুন-গুন, কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে ওর গানে।

আঃ! কী সুন্দর আজ সকালটা! খুশিতে উছলে গেছে আকাশ। সোনা-সোনা রোদ ছড়িয়ে গেছে মুঠো মুঠো। মাঠে মাঠে। গাছে গাছে। ফুলে ফুলে। ছড়িয়ে গেছে পাপুই-এর চোখ দুটিতে। পাপুই আজ কাজল পরেছে চোখে। চোখের পাতা দুটি নেচে নেচে উঠছে। খুশিতে। কাজল চোখে আলো দেখছে পাপুই। গান গাইছে।

সেজেছে পাপুই। ডুরে ডুরে শাড়ি পরেছে। লাল-পাড়।

কানে কানে ফুল দুলেছে দুল-দুল।

পায়ে পায়ে মল বেজেছে ঝুম-ঝুম।

এমন সকালে মন নেই ঘরে। ওর পা দুখানি শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে ছুটছে। রাঙা টুকটুক আলতা-পরা পা দুটি নাচছে। শিশিরে ভিজে ভিজে।

এখানটা বেশ লাগে। এই নিঃঝুম জায়গাটা। এখানে রোজ আসে পাপুই। কেউ নেই এখানে। আছে কাঠবিড়ালি। মুঠি ভর্তি বাদাম এনেছে পাপুই। ছড়িয়ে দিচ্ছে ঘাসে ঘাসে। ছুটে আসছে কাঠবিড়ালি। অগুনতি। খেলা করছে পাপুই-এর সঙ্গে। ধরতে যাচ্ছে পাপুই। পালাচ্ছে। গাছের ঐ আগডালে লুকিয়ে পড়ছে কেমন!

"আয় আয়।" ডাকল পাপুই।

আসবে না।

ঝুম-ঝুম মল বাজাল পাপুই।

শুনল না।

গুন-গুন গান গাইল।

ওমা! কোথা ছিল কাঠবিড়ালি এত! একেবারে পাপুই-এর হাতের মুঠোয়। গায়ের ওপর। লুটোপুটি লাগিয়ে দিলে। ওরা গান শুনবে। পাপুই-এর গান। আর বাদাম খাবে।

গাইছিল পাপুই। গান। আপন মনে গাইছিল। আর খেলছিল।

হঠাৎ যেন চমক লাগে!

"টগ-বগ, টগ-বগ!"

কে যেন আসছে ঘোড়া ছুটিয়ে? কে আসে এইখানে, এই নির্জনে?

"টগ-বগ, টগ-বগ।" ঘোড়া ছুটছে। দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে, "টগ-বগ, টগ-বগ।"

শুনতে পেল না পাপুই। ও শুনতে পাবে না। এত আলো আজ আকাশ-ভরা। ও শুধু গান গাইবে। মিষ্টি-মিষ্টি কাঠ-বিড়ালির দুষ্টু-দুষ্টু চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে।

ঘোড়া থামল।

ও কে? ঘোড়ার পিঠে বসে?

রাজা।

রাজা! এ কেমন রাজা! রাজার মাথায় মুকুট কই?

নেই, নেই।

মুকুটে মানিক কই?

তাই তো!

রেশমি পোষাক কই?

নেই তো!

কেমন করে থাকবে? রাজা আজ রাজ-পোষাক সরিয়ে রেখেছেন। তিনি আজ ছদ্মবেশে লুকিয়ে বেরিয়েছেন। দেখতে বেরিয়েছেন রাজ্যের অবস্থা!

কিন্তু এখানে কে গান গায়? এই নির্জনে? শুনতে পেয়েছেন রাজা। ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়িয়েছে রাজার ঘোড়া। চুপিসাড়ে নেমেছেন তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছেন।

ও কে? চমকে চাইলেন রাজা।

একটি ছোট্ট মেয়ে!

আঃ! কী মিষ্টি ছোট্ট মেয়েটি। কী মিষ্টি গান গাইছে। যেন একটি পাখি! অবাক!

থাকতে পারলেন না রাজা লুকিয়ে। এগিয়ে গেলেন একেবারে তার সামনে!

দেখো! দেখো! ছুটে পালাল কাঠবিড়ালিরা ঝটপট।

উঠে দাঁড়াল পাপুই চোখের নিমেষে। থেমে গেছে গান। রাজার দিকে তাকিয়েছে পাপুই। ঠোঁট দুটি কাঁপছে। চোখের পাতা দুটি নামছে। আস্তে। লজ্জা হয়েছে।

রাজার মুখে আদর মাখা হাসি। হাত বাড়ালেন রাজা। ডাকলেন, "এস।"

মুখ ঘুরিয়ে নিল পাপুই। লজ্জা! লজ্জা! কী লজ্জা! ছুট দিল পাপুই।

পায়ের মল বেজে উঠল, ঝুম-ঝুম।

ডুরে শাড়ি উড়ে গেল, ফুর-ফুর।

কানের ফুল দুলে উঠল, দুল-দুল।

দাঁড়াল না পাপুই। ছুটতে ছুটতে লুকিয়ে গেল। লুকিয়ে গেল রাজার চোখের আড়ালে।

রাজা হেসে উঠলেন।

আবার ঘোড়া ছুটল, "টগ-বগ, টগ-বগ।"

ঘোড়া ছুটল রাজবাড়ির দিকে।

তারপর?

পরের দিন ঘোড়া সাজল, একশো।

ঘোড়ার পিঠে সিপাই ছুটল, একশো।

কোথা?

গ্রামের দিকে। পাপুই-এর বাড়ির দিকে। রাজার হুকুম।

পাপুই-এর ঘরের দরজায় টোকা পড়ল, "টক, টক, টক।"

"কে?" ঘরের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল একটি ছোট্ট ছেলে। চাঁদ। পাপুই-এর দাদা।

দরজা খুলে হকচকিয়ে গেল চাঁদ। ঘরের সামনে সিপাই। ঘোড়ার পিঠে। এদিক ওদিক চারদিকে সিপাই ঘিরে আছে। ভয় পেয়ে গেল চাঁদ। কথা বলতে গলা কাঁপল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলে, "কাকে চান আপনারা?"

সর্দার সিপাই জিজ্ঞেস করলে, "এ বাড়ি কাদের?"

"আমাদের।" উত্তর দিল চাঁদ।

"এ বাড়িতে গান গায় কে ?"

"আমার বোন, পাপুই।"

নেমে এল সর্দার ঘোড়ার পিঠ থেকে। বললে, "আমরা রাজার কাছ থেকে আসছি।"

"কেন ?" অবাক হল চাঁদ।

"রাজা তোমার বোনকে এই মানিকমালা পাঠিয়ে দিয়েছেন।" এগিয়ে দিল সিপাই-সর্দার মানিকমালা চাঁদের হাতে। আর দিল একটি চিঠি।

অবাক হল চাঁদ, "কার চিঠি !"

ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এল পাপুই, "কার চিঠি ?"

উত্তর এল, "রাজার।"

চাঁদ খুলে ফেলল চিঠি। হাত কাঁপছে। লিখেছেন ঃ

ছোট্ট মেয়েটি,

তোমার আমি নাম জানি না। কী মিষ্টি গান গাও তুমি ! গাছের ছায়ায় নেচে নেচে তুমি গাইছিলে। তোমার গান শুনছিলাম। পালিয়ে গেলে কেন ? লজ্জা করল ? একদিন এস না আমার রাজবাড়িতে ? আমায় গান শুনিয়ে যাবে। নিমন্ত্রণ রইল। সাতদিন পরে চৌদোলা পাঠিয়ে দেব। আসবে তো ? মানিকের হার পাঠালাম। তোমার অমন মিষ্টি গানের জন্যে আমার ছোট্ট উপহার। গলায় পরো, কেমন ?

মুখখানা খুশিতে উছলে গেল চাঁদের। আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল চাঁদ, "পাপুই-ই-ই।" জড়িয়ে ধরল বোনটিকে। পরিয়ে দিল মানিক-মালা পাপুই-এর গলায়। আলো, আলো। চারিদিকে আলো জ্বলছে। মানিকের আলো। হেসে উঠল পাপুই। ছুটল বাইরে। খোলা আকাশের নিচে। গেয়ে উঠল পাপুই। হেসে নেচে গড়িয়ে গেল চাঁদ।

চাঁদ আর পাপুই। ভাই আর বোন। আর কেউ নেই ওদের। ছোট্ট কুঁড়েঘর। সেখানে থাকে ভাইটি আর বোনটি। পাশে থাকে এক বুড়ো। একটু দূরে। পুতুলওলা। ওরা ডাকে পুতুলদাদু।

পুতুলদাদু খুব বুড়ো। হাঁটতে পারে না। ঘরে বসে বসে পুতুল তৈরি করে। কোনটা রাজা। কোনটা রানী। কোনটা হাঁস। কোনটা পাখি। চাঁদ বেচে আসে সেই পুতুল মাথায় নিয়ে হাটে, মেলায়। দোরে দোরে। পয়সা পায়। নিজে নেয়। পুতুলদাদুকে দেয়। একবার পুতুলদাদু কী সুন্দর একটা পুতুল তৈরি করেছিল! নাম দিয়েছিল, "মিষ্টি তারা"।

আহা! সত্যিই যেন তারা। আকাশ থেকে নেমে এসেছে। মিষ্টি তারার মাথায় একটি তারার ফুল। মুখখানি গোল। কানে তার তারার দুল। কপালে তারার টিপ। চাঁদ দেখে পুতুলের মুখখানির দিকে রোজ। দেখে রোজ পাপুই-এর চোখ দুটির দিকে। লুকিয়ে লুকিয়ে। ভাবে যেন ঠিক এক। পাপুই-এর চোখ দুটি যেন কে ঠিক পুতুলের চোখে বসিয়ে দিয়েছে। কাজলে সাজিয়ে দিয়েছে। বেচবে না চাঁদ এ-পুতুলটি কোনদিন। কোনদিন না। রেখে দেবে দেরাজে। যখন ইচ্ছে হবে দেখবে মুখটির দিকে। ঐ চোখ দুটির দিকে। দেখতে দেখতে হাসবে। আপন মনে।

একদিন চাঁদ সত্যি-সত্যি হাসছিল পুতুলটির দিকে চেয়ে। দেখে ফেলেছিল পাপুই। জিজ্ঞেস করেছিল, "হাসছ কেন দাদা, পুতুল দেখে?"

চাঁদ বলেছিল, "ভালো লাগে।"

"কই দেখি আমারও হাসি পায় কিনা?"

দেখেছিল পাপুই। হেসে উঠেছিল খিলখিল করে। বলেছিল, "কী মিষ্টি পুতুল, না দাদা?"

আজ মেলা। পুতুল বেচতে গেছে চাঁদ আজ সকাল সকাল।

আজ অনেক পুতুল বেচতে হবে। অনেক পয়সা চাই যে! পাপুই রাজবাড়ি যাবে। রাজাকে গান শোনাবে। কী সাজে যাবে পাপুই?

চাঁদ আজ সবুজ শাড়ি কিনে আনবে। সবুজে ঝুমকোসারি দেখে আনবে। ওর গায়ে সাজিয়ে দেবে সবুজ শাড়ি। ওর পায়ে বাজিয়ে দেবে রূপার মল।

পা ছুটছে চাঁদের, অনেক দূরে। মেলায়।

ভাবছে পাপুই, ঘরে। রাজাকে কোন গানটা শোনাই! ভাবছে, গুন-গুন-গুন গাইছে। গাইছে, আবার ভাবছে।

এমন সময় কে যেন ডাকল বাইরে, "ঘরে কে আছ?"

ঘরের দরজা নড়ে উঠল, "খট, খট, খট।"

ওমা! ওমা! একটা চিল কেন চেঁচিয়ে ওঠে ভরদুপুরে অমন করে!

একটা বেড়াল কেন কেঁদে ওঠে দিনদুপুরে এমন স্বরে!

পাপুই-এর গুন-গুন গান থেমে গেল। চমকে চাইল। সাড়া দিল, "কে?"

"আমি।" খ্যান-খ্যানে সরু গলা। কাঁপা কাঁপা।

ঘরের দরজা খুলে গেল।

একটা বুড়ি দাঁড়িয়ে। দোরে। থুথথুড়ি। নড়বড়ি। না-ডাকতে তড়তড়িয়ে ঘরে ঢুকল। গড়গড়িয়ে বলে গেল, "তোমার নাম বুঝি পাপুই? আমি রাজার বাড়ির ঝি। রাজা আমায় পাঠিয়ে দিলেন তোমার কাছে। আমার হাতে ভেট পাঠালেন তোমার জন্যে। রাজাকে কী গান শুনিয়েছ মা? রাজা তোমার গান শুনে সব ভুলেছেন। রাজ-কাজে মন নেই তাঁর। খালি বলছেন, তোমার কথা। তোমার গানের কথা।"

পাপুই আর জানবে কি করে, এ বুড়ি রাজার বাড়ির ঝিও নয়, এ ভেট রাজারও নয়? এ-যে এক ডাইনি-বুড়ি! হিংসুটে! দুষ্টু! পাপুই-এর গলায় ঐ যে মানিকমালা, ঐটাতে তার চোখ

পড়েছে। লোভে লোভে চোখ জ্বলেছে। তাই তো রোদ-দুপুরে ঝি সেজেছে রাজবাড়ির। মিথ্যে মিথ্যে। এই সেরেছে! কী হবে তা হলে?

পাপুইরানী তো আর তা জানে না। ভাবলে বুঝি সত্যি সত্যি। তাই ব্যস্ত হল। ছুটে গেল। পিঁড়ি আনল। তাড়াতাড়ি বসতে দিল। বললে, "তুমি রাজার বাড়ির ঝি। তোমায় কিসে বসতে দিই!"

বুড়ির বাঁকা ঠোঁটে হাসি। দেখতে পেল না পাপুই। বললে, "না, না, তোমায় অত ব্যস্ত হতে হবে না আমার জন্যে। আগে দেখে নাও মা ভেটের ফর্দটা।"

ভেটের থালা হাতে নিল পাপুই।

আহা! চাঁপা-বরণ রেশমি শাড়ি। নীল-আকাশি জামা। রূপার থালায় সোনার বাটি। বাটি ভর্তি মিষ্টি চাঁচি। মণ্ডা-মিঠাই।

পাপুই বললে, "বুড়িমা, ভরদুপুরে আসছ। মুখ-হাত-পা ধুয়ে নাও। মিঠাই খাও।"

বুড়ি থমকে গেল। ভয় পেল। উঠে দাঁড়াল। বললে, "না, মা! ও মিঠাই রাজা তোমাকে দিয়েছেন। আমি কেমন করে খাই!"

"না, না। তুমি রাজার মিঠাই কেন খাবে? আমার ঘরে আর কি কিছু নেই! শুধু মুখে যেতে আছে?" বলে পাপুই নাড়ু আনল বাটি সাজানো। জল আনল ঘটি ভর্তি।

বুড়ি বললে, "এত নাড়ু কী হবে?"

"খাও।" বাটি রেখে বুড়ির সামনে বসল পাপুই।

"বেশ, আমি নাড়ু খাচ্ছি। তুমি রাজার দেওয়া একটি মিঠাই খাও আগে।" বলে একটি মিঠাই তুলে নিল বুড়ি ভেটের থালা থেকে। পাপুই-এর মুখের কাছে ধরে দিল।

সব্বনাশ! ঐ মিঠাইটা যাদু-করা। বিষ পোরা!

খেয়ে ফেলল পাপুই। আঃ! কী মিষ্টি! কী সুন্দর! মুখখানি

হাসিতে ভরে গেল তার।

কী হবে এখন?

গপগপ করে গালে ফেলে গিলে ফেলল বুড়ি নাড়ুগুলো। ঢকঢক করে জল খেলে। তারপর পাপুই-এর মুখের দিকে চেয়ে দেখলে।

"কী দেখছ?" জিজ্ঞেস করলে পাপুই।

"মুখখানি তোমার!"

লজ্জায় নামিয়ে নিল মুখখানি পাপুই মাটিতে।

বুড়ি আবার বললে, "দেখছি কী আর সাধ করে! কী যাদু করেছিস মা রাজাকে, তাই দেখছি। কী গান শুনেছেন রাজা? আমায় একটা শোনা না মা।"

"নিশ্চয়ই শোনাবো। তুমি রাজবাড়ির ঝি। তোমায় শোনাবো না! কি গান শুনবে বল?"

"যে গান খুব ভালো।"

কোন গানটা একটু ভালো, আর কোন গানটা খুব ভালো ভাবছে পাপুই। একটু চোখ মেলে আকাশে চাইল। তারপর গুন-গুন-গুন সুর তুলল।

একী! একী! পাপুই-এর কী হল? গান গাইতে পারছে না যে! গলা আটকায়! বিষম খায়!

কেন?

"কী হল মা?" বুড়ি জিজ্ঞেস করলে। "কী হল? গান গাইতে কষ্ট হচ্ছে? বিষম লাগছে?"

পাপুই মুখটা ঘুরিয়ে নিলে। নিজেকে সামলে নিলে, বললে, "না, না, কিচ্ছু না।" আবার গাইল।

না, না! পারল না তো!

আবার।

সুর আসে না।

আর একবার।

দোল আসে না।

সেই শেষবার।

গান এল না।

কেঁদে ফেলল পাপুই। কাজল-পরা-চোখ দুটি ওর উপচে গেল। জিজ্ঞেস করলে, "বুড়িমা, তোমার মিঠাই খেয়ে এ আমার কী হল! তোমার মিঠাই-এ কী ছিল তাই বল।"

বুড়ি চমকে উঠল থতমত খেয়ে। বললে, "ওমা! ওমা! এ-যে রাজার দেওয়া মিঠাই। এ মিঠাই-এ কী থাকবে?"

"তবে কেন গান আসে না আমার মিঠাই খেয়ে? সুর আসে না মনে? দোল আসে না সুরে?"

বুড়ি বাঁকা চোখে চাইল। বললে, "আর একবার চেষ্টা করে দেখ।"

কী হবে চেষ্টা করে?

তবু চেষ্টা করল পাপুই আর একবার। না, না, পারল না সে। পারল না সে বসে থাকতে। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। কান্নার জলে ভেসে গেল ওর চোখ দুটি। গাল দুটি। মুখখানি।

বুড়ি উঠে দাঁড়াল। ট্যারা চোখে পাপুই-এর গলার দিকে তাকাল। গলায় তার মানিকমালা! লোভে চোখ দুটো ঠিকরে আসছে। হঠাৎ বললে, "দোষ লাগে নি তো!"

চমকে উঠল পাপুই। "কিসের দোষ?"

"ওই মানিকমালার!"

থমকে গেল কান্না। "সে কী!"

ড্যাবড়া-ড্যাবড়া চোখ দুটো বুড়ির। লাল-লাল। লাল-লাল চোখ দুটো কেঁপে কেঁপে উঠল। বললে, "ও যে রক্তমানিক!"

"তাতে কী!"

"শক্ত বড় গলায় পরে সহ্য করা।"

"কেন?"

"মানিক কী আর সবার গায়ে সয়! মানিক কী আর সবার কাছে রয়!"

"তবে?"

"এক্ষুনি খুলে ফেল। তোমার গান গেছে। তোমার দাদারও যদি কিছু হয়?"

ভয়ে শিউরে উঠল পাপুই। না, না। দাদার সে কিছু হতে দেবে না। কিছুতেই না। খুলে ফেলল গলার মালা। ছুঁড়ে ফেলে দিতে গেল।

বুড়ি ছুটে গেল। বাধা দিলে, "ফেল না, ফেল না।"

"তবে? এ মালা আমি রাখব কোথা?"

"যার মালা তাকে ফেরৎ পাঠাও। আমাকে দাও। আমি ফেরৎ দিয়ে দেব রাজাকে।"

ভাবল না আর কিচ্ছু পাপুই। তুলে দিল বুড়ির হাতে মানিকমালা।

বুড়ি হেসে উঠেছে খ্যান-খ্যান করে। ছিনিয়ে নিয়েছে মানিকমালা পাপুই-এর হাত থেকে। দোর ঠেলেছে। হুড়-হুড় করে পালিয়ে গেছে।

আঁৎকে উঠল পাপুই। বুড়ির হাসি শুনে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। বিছানায় আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়ল। মুখ গুঁজে ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠল পাপুই।

আজ অনেক দেরী হয়ে গেল চাঁদের ঘরে ফিরতে। দেরি তো হবেই। কত জিনিষ কিনেছে চাঁদ পাপুই-এর জন্যে। দোকানে ঘুরে ঘুরে। ঘরে এসেছিল সে খুশিতে গাইতে গাইতে। হাতে তার রূপার মল। নতুন। পায়ে পরিয়ে দেখবে চাঁদ, এ-মল পাপুই-এর পায়ে কেমন মানায়। ঝুম-ঝুম রূপার মল বাজাতে বাজাতে ঘরে ঢুকেছিল চাঁদ। ডাকতে ডাকতে, "পাপুই-ই-ই।"

কিন্তু পাপুই কই?

কোথা ?

কাঁদছে পাপুই ঘরের কোণে। চুপটি করে।

কেন ? চমকে ওঠে চাঁদ। "কী হয়েছে ?" ছুটে গেল চাঁদ। "কী হয়েছে ?" অবাক হল চাঁদ।

পাপুই-এর দু' চোখে জল। শুধু জল। গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

"কাঁদছ কেন পাপুই ?" আদরে জড়িয়ে ধরল চাঁদ বোনকে।

হাউ হাউ করে ককিয়ে উঠল পাপুই, "দাদা।" তারপর দাদার কোলে লুটিয়ে পড়ল। হারিয়ে গেছে—তার সব হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে তার গান। তার সুর। তার দোলা।

চাঁদের হাত থেকে ছড়িয়ে পড়ল রূপার মল। মাটিতে। লুটিয়ে গেল রেশমি শাড়ি, রঙ-বাহারি। হারিয়ে গেল কানের দুল, রঙিন-ফুল। চাঁদের মুখে মেঘের ছায়া। বোনটির মুখের দিকে তাকিয়ে তারও চোখ ছলছল। ভাবছে চাঁদ, কী হবে এখন ? কেমন করে রাজার কাছে যাবে পাপুই। কেমন করে গান শোনাবে ? ছিঃ ! ছিঃ !

তিন দিন কেটে গেল। ঘুময় না চাঁদ। ঘুময় না পাপুই। ক'দিন আকাশে মেঘ ছিল। আজ রোদ উঠেছে। আজ থেকে আবার পুতুল বেচতে যাবে চাঁদ। কি মনে হল, ও আজ দেরাজ খুলেছে। মিষ্টি তারা পুতুলটিকে আজ সঙ্গে নেবে চাঁদ। কী হবে দেরাজে সাজিয়ে রেখে মিছিমিছি। বেচে দেবে।

"কোথা যাচ্ছ দাদা ?" জিজ্ঞেস করল পাপুই।

"হাটে।"

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ডাইনির মুখটা। সেই ভয়ঙ্কর চোখ দুটো। খ্যান-খ্যানে হাসি। দাদার হাত দুটো চেপে ধরল পাপুই। ব্যস্ত হয়ে বললে, "না-ই বা গেলে আজ।"

শুনল না চাঁদ। হাটে চলল।

জানলায় চোখ মেলে দাঁড়িয়ে রইল পাপুই।

হাঁটছে চাঁদ। পাপুই-এর চোখ দুটি যতক্ষণ দেখতে পায় দাদাকে, চেয়ে রইল। তারপর দুটি চোখ দিয়ে দু'ফোঁটা জল দুটি মুক্তার মত গড়িয়ে পড়ল।

হাঁটছে চাঁদ। এখনও। এখনও অনেকক্ষণ হাঁটবে।

কিন্তু ও কে সামনে?

একটা বুড়ি। পিঠে কাঠের বোঝা। বোঝার ভারে নুয়ে পড়েছে। হাঁটতে পারছে না। ভারি কষ্ট!

দেখতে পেয়েছে চাঁদ। মায়া লাগল। আহা-রে! বুড়ো মানুষ। অত কাঠ বইবে কেমন করে?

ছুটে গেল চাঁদ। বুড়ির কাছে। বললে, "ও বুড়িমা, ও বুড়িমা, কোথা যাচ্ছ? দাও তোমার কাঠের বোঝা আমি পৌঁছে দিই, তোমার ঘরে।"

বুড়ি ক্লান্ত। ঘাম ঝরছে। হাঁপাচ্ছে। চাঁদের মুখের দিকে তাকাল। হাসি ফুটল ক্লান্ত মুখে। বললে, "লক্ষী ছেলে।"

চাঁদ মাথায় পুতুলের সাজি নিলে। পিঠে কাঠের বোঝা বাঁধল। হাঁটল বুড়ির পিছু-পিছু। জানতেও পারল না কার পিছু হাঁটছে ও। ও যে সেই ডাইনি! জানতেও পারল না ডাইনির চোখ আজ তার ওপরে!

সামনে বিপদ!

হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা এসে চাঁদ ভাবলে, এদিকে তো সে কোনদিন আসেনি। এ কোথায় চলেছে সে! জায়গাটা তো চেনা নয়। তাই বললে, "ও বুড়িমা, কোনদিকে গো তোমার ঘর?"

বুড়ি বললে, "ঐ দিকে। কেন বাছা, তোমার কষ্ট হচ্ছে?"

চাঁদ বললে, "না, না।"

ঐ ওদিকে আর একটু হাঁটল চাঁদ। পথটা যখন আরও অচেনা লাগল, তখন চাঁদ আবার জিজ্ঞেস করলে, "ও বুড়িমা, আর কতদূর তোমার ঘর?"

বুড়ি বললে, "আর নয় গো, দূর নয়।" বলে বুড়ি একটা ঝুপঝুপ

বনে ঢুকল। চাঁদও পিছু-পিছু হাঁটল।

অবাক কাণ্ড! এতক্ষণ আকাশে রোদ ছিল। হঠাৎ মেঘ এল কোত্থেকে? বাব্বা! কালো মেঘে আঁধার করে এসেছে। মেঘের সাজন কী! এক্ষুনি ঝড় উঠবে। মনে হচ্ছে।

বলতে বলতেই ঝড় উঠল। গাছের মাথায় মাথায় ঝড়ের লুটোপুটি। ঠোকাঠুকি। ঝরা-পাতায় ঝড়ের ঘূর্ণি লেগেছে। গুড়-গুড়-গুড় মেঘ ডেকেছে।

ঝির, ঝির, ঝির,
ঝিম, ঝিম, ঝিম,
ঝুম, ঝুম, ঝুম,
ঝম,ঝম, ঝম,
বিষ্টি নামল।

সামনে চাইল চাঁদ তাড়াতাড়ি। একী! বুড়িকে তো দেখতে পাচ্ছে না চাঁদ! কোথায় গেল!

ডাকল চাঁদ, "ও বুড়িমা!"

না, কিচ্ছুই শোনা গেল না। যা ঝড়। কোনই সাড়া পেল না।

আর দাঁড়ান যাবে না। পুতুলগুলো ভিজে যাবে। নষ্ট হবে।

সামনে ওটা কী?

একটা ভাঙা-ভাঙা ঘর।

কী মনে হল চাঁদের, ছুটে ঘরের দাওয়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কেউ নেই ঘরে। ফাঁকা। ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ওর চোখ দুটি খুঁজতে লাগল বুড়িকে! তাইতো বুড়িমা গেল কোথা? ঝড়ে পড়ল? না ঘরে ছুটল? ঘর কোথা, কোনদিকে? ঝড় না থামলে খুঁজবে কেমন করে চাঁদ?

খুলে ফেলল পিঠের বোঝা কাঠগুলো। পাশে রাখল পুতুলের সাজিটা। চেয়ে দেখল। না, বেঁচে গেছে। জল লাগে নি পুতুলদের গায়ে। না, কিচ্ছু হয় নি মিষ্টি তারা পুতুলটির। সত্যি, কী সুন্দর

মিষ্টি তারা পুতুলটি! হাতে তুলে নিল চাঁদ। চোখ মেলে চেয়ে রইল পুতুলের চোখের দিকে। পাপুই-এর চোখের দিকেও এমনি করে চেয়ে দেখে চাঁদ। পাপুই! মনে পড়ে গেল চাঁদের হঠাৎ। ছোট্ট বোনটি তার কি করছে এখন? আহা! কী হল তার? কে চুরি করল তার গান?

ঘুম পাচ্ছে চাঁদের বসে বসে।

কেন? এখন তো ঘুময় না চাঁদ?

থাকতে পারল না। শুয়ে পড়ল ঘরের দাওয়ায়। ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর কিচ্ছু জানে না। জানে না চাঁদ, কখন ঝড় থেমে গেছে। কখন বিষ্টি ধরে গেছে। জানে না এখনও মেঘ কেটেছে কিনা। আবার কি ঝড় উঠবে? আবার কি আকাশ কাঁপিয়ে বিষ্টি নামবে ঝমঝমিয়ে?

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল ডাইনিটা!

কোথা থেকে?

উঃ বাব্বা! চমকে উঠতে হয়। লুকিয়ে ছিল বনে। ঐ গাছের আড়ালে। ওখান থেকেই যাদু করেছে চাঁদের চোখ দুটিতে। ঘুম-পাড়ানি যাদু! তাইতো ঘুমিয়ে পড়েছে চাঁদ। এখন ওর ঘুম ভাঙবে না।

সত্যি, ঘুম ভাঙে নি চাঁদের।

দিন পেরিয়ে সাঁঝ এসেছিল। ঘুম ভাঙে নি।

সাঁঝ পেরিয়ে রাত এসেছিল। তবুও জাগে নি।

বুড়িটা সারাদিন হেসে হেসে নেচেছিল। নেচে নেচে গেয়েছিল। সে-গান শুনতে পায় নি চাঁদ!

এখন একটি একটি তারা আকাশে। রাত নেমেছে।

একটি একটি জোনক নাচছে গাছের ফাঁকে।

একটি একটি প্যাঁচা ডালে ডালে।

ওটা কী? কী ওটা? ডাইনির হাতে? অন্ধকারে চকচক করছে!

একটা দা। দা-টা হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল ডাইনি চাঁদের দিকে। মারবে নাকি চাঁদকে?

হ্যাঁ, কাটবে। ঐ তো দা তুলেছে। এই মারল, মারল!

না, পারল না।

"ক্যাঁক ক্যাঁক।" একটা পেঁচা চেঁচিয়ে উঠল আচমকা। চমকে ভয়ে থমকে গেল ডাইনি। গাছের দিকে চাইল। প্যাঁচাটাকে দেখতে পেলে। খ্যান-খ্যান করে চেঁচিয়ে উঠল। হাসল, না কাঁদল কে বুঝবে? ভয়ে পালাল প্যাঁচাটা ডাল ছেড়ে আকাশে! চেয়ে রইল ডাইনি আকাশের দিকে।

হঠাৎ এত আলো এল কোত্থেকে? চাঁদের পাশে পুতুলের সাজি। নড়ছে যেন! হ্যাঁ, হ্যাঁ! দেখো, দেখো মিষ্টি তারা পুতুলটি নড়েচড়ে বসছে যেন!

বসছে না তো উঠছে।

তাইতো!

ঐ তো সে সাজি ডিঙিয়ে বাইরে আসছে! দেখো, দেখো কত আলো! ঠিকরে পড়ছে মাথার তারার ফুলটি থেকে, কানের তারার দুলটি থেকে।

ওমা! দাঁড়াল যে মিষ্টি তারা পুতুলটি চাঁদের মাথার সামনে! কে বলবে তাকে পুতুল এখন? ঠিক যেন একটি মিষ্টি মেয়ে। আলোর মেয়ে।

কত আদর বুকে বুকে জমা হয়েছে ওর এতদিন চাঁদের। কত ভালোবাসা পাপুই-এর। চাঁদের বিপদ। আজ সে কেমন করে পুতুলটি হয়ে ঘুমিয়ে থাকে!

হঠাৎ ঝলসে গেল ডাইনির চোখ দুটো। ঘুরে দাঁড়াল। হাত দুটো কেঁপে উঠল। লোভে! চকচকে দা-টা হাত থেকে পড়ে গেল মাটিতে। ওকী? আলো, না মানিক? মানিক না হীরা? হীরা না পান্না? চোখ ধাঁধিয়ে গেল ডাইনির! ডাইনির চাই। সব চাই। মানিক চাই, মণি চাই, পান্না চাই। হাত বাড়াল
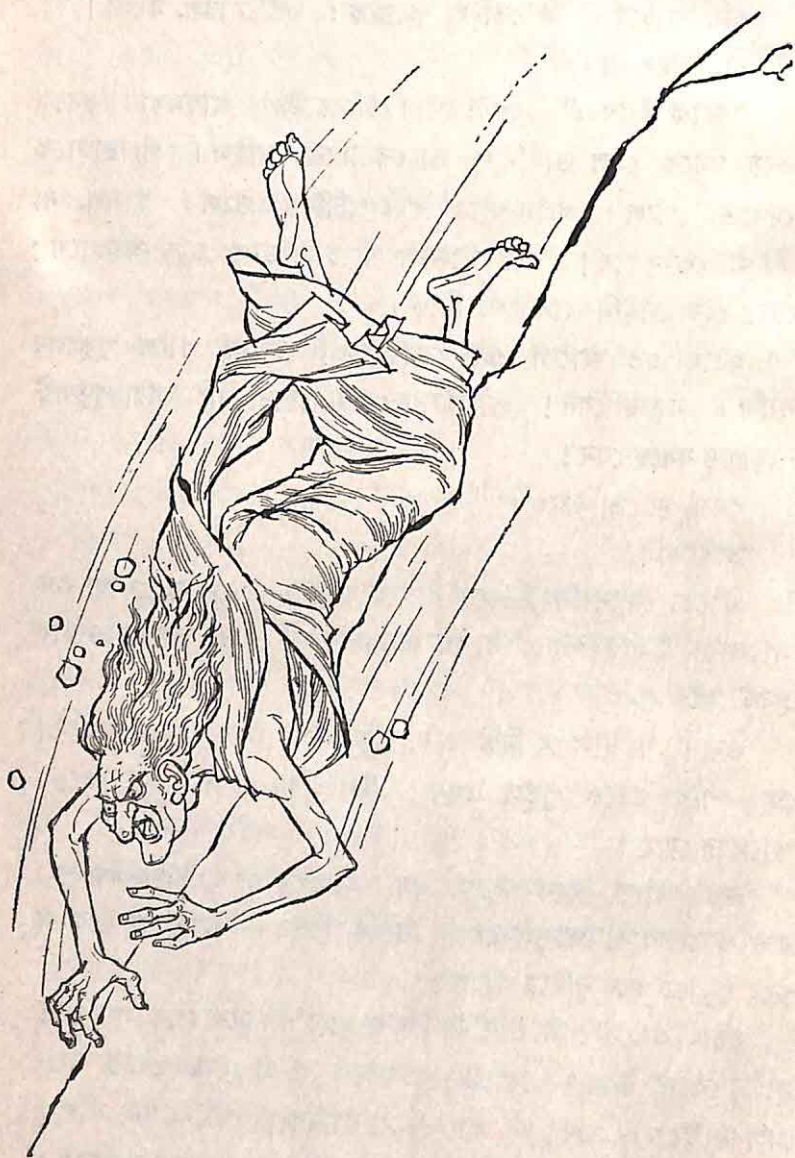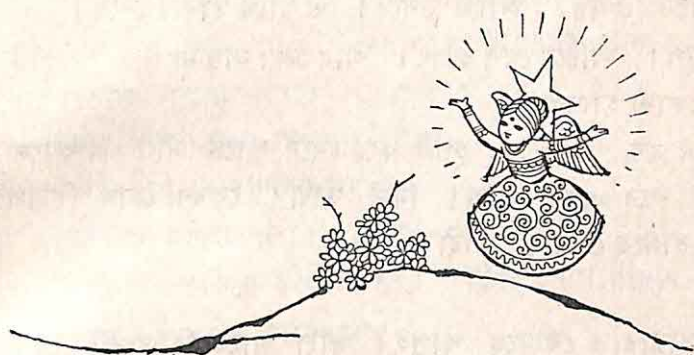
ডাইনি। ধরতে গেল আলোর মেয়েকে। ছুট দিল মিষ্টি তারা। ছুটল ডাইনি তার পেছনে।

অন্ধকার বন। মিষ্টি তারা ছুটছে। আলোয় নাচছে। বুড়ির চিৎকারে বন কাঁপছে।

ছুটতে ছুটতে বন পেরুল। বনের শেষে একটা মস্ত পাহাড়। পাহাড় উঁচু। পাহাড় নিচু। এদিকে খাদ। ওদিকে পথ। আলোর মেয়ে পাহাড়ে উঠে গেল।

হাঁপিয়ে গেছে বুড়ি। তবু উঠবে। পাহাড়ে। আলো দেখবে। আলোর পিছু ছুটবে।

ছুটতে ছুটতে, আলো দেখতে দেখতে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল বুড়ির। দেখতে পেল না সামনে খাদ। ভীষণ! এই যাঃ! পা ফসকে গেছে বুড়ির। পড়েছে। ধপাস! ধাঁই! একেবারে খাদের ভেতর! ব্যস! চিৎকার করে উঠল বুড়ি খাদের ভেতর থেকে, "বাবা-গো, মলুম-গো!" তারপর আর কোন সাড়া নেই। সব থমথম। চুপচাপ। ডাইনি খাদের ভেতর অক্কা পেয়ে গেল।

কোথা গেল আলোর মেয়ে?

ঐ তো, ঐ দেখো এখনও ছুটছে।

পাহাড়ের মাথায় নীল আকাশ। আকাশের বুকে কত, ক—ত তারা। গোনা যায় না। আলোর মেয়ে ছুটছে। ছুটছে

পাহাড়ের ওপরে। আরও ওপরে। ও যাবে তারার দেশে।

টুপ! হারিয়ে গেল হঠাৎ। আর দেখা যায় না।

কোথা হারাল?

ঐ যে, ঐ দেখো, চুপটি করে বসে আছে নীল আকাশে। চুপটি করে একটি তারা! মিষ্টি তারা। কেমন চোখ পিটপিট করে হাসছে দেখো! আহা!

সারারাত কেঁদেছে পাপুই। দাদা আসে নি তার। কোথা গেল? ভেবেছে। জানলায় মুখটি বাড়িয়ে চোখ দুটি খুঁজেছে দাদাকে আঁতিপাঁতি।

ভোর হয় নি তখনও। পাখি গায় নি। রাত যায় নি। পাপুই থাকতে পারে নি ঘরে। ওর মন কোন মানা মানবে না। ও বেরিয়ে পড়েছে পথে। দাদাকে খুঁজবে ও। ডাকছে, "দাদা-আ-আ।" কাঁদছে।

এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল চাঁদ। হঠাৎ ওর চমক লাগল। জেগে উঠল। ছিঃ! ছিঃ! একী! এ যে রাত! ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল। এ কোথা এসেছে সে? তার পুতুল? ঐ তো সাজিতে। একটি একটি করে দেখল অন্ধকারে। কিন্তু কই তার মিষ্টি তারা পুতুলটি?

নেই, সে নেই।

কোথা গেল?

হাতড়ে হাতড়ে খুঁজল। হঠাৎ মন কেঁদে উঠল পাপুই-এর জন্যে। ছুট দিল সে। ছুট দিল বনের বাইরে।

হঠাৎ শুনতে পেয়েছিল চাঁদ পাপুই-এর ডাক। বনের বাইরে। এ তো ডাক না। এ-যে কান্না। এ-যে কান্নার গান। দাদার জন্যে আকুল হয়ে কাঁদছে পাপুই। ওর কান্না যেন গান হয়ে ভেসে যাচ্ছে।

ভোর হয়ে আসছে। তখনও জাগে নি আলো। জাগে নি

পাখি। জাগে নি ফুল। শুধু জেগে উঠেছে চাঁদের মন। আনন্দে। খুশিতে। আর জেগে আছে তখনও আকাশে অনেক তারা। একটু পরে ভোরের আলো আসবে। তারারা ঘুমিয়ে পড়বে।

চাঁদ চেঁচিয়ে ডাকল, "পাপুই-ই-ই।"

দেখতে পেয়েছে দাদাকে পাপুই।

ছুট্টে এসে জড়িয়ে ধরল চাঁদ পাপুই-এর গলাটি।

"দাদা।" ককিয়ে উঠল পাপুই। লুটিয়ে পড়ল দাদার বুকে। ভেসে গেল দাদার বুক চোখের জলে।

"পাপুই।" মিষ্টি, ছোট্ট একটি ডাক। দাদা ডাকল। বুক থেকে মুখটি তুলে নিল। চিবুকে হাত দিল চাঁদ। চোখ দুটি মুছে দিল। বললে, "কাঁদছ পাপুই?" বলে নিজেই কেঁদে ফেললে।

দাদার চোখে হাত দিয়ে পাপুই বলল, "তুমি কেন কাঁদছ?"

"আমার যে আজ খুশির দিন। তুমি যে আবার গান গাইছ। কেমন করে গাইছ পাপুই?"

"জানি না।" আকাশে চাইল পাপুই।

চাঁদও চাইল আকাশে। ওপরে। পাপুই-এর চোখ দুটির দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, "দেখ পাপুই, আকাশে কত তারা।"

পাপুই-এর ছলছল চোখ দুটি টলমল করে উঠল। বললে, "দেখ, দেখ, ঐ তারাটি কত সুন্দর!"

"সত্যি! ভারি সুন্দর! ও যেন আমার বোন, আমার পাপুই।"

তারপর তারাটি টুপ করে ডুবে গেল আকাশে।

তখন আলো ফুটছে একটু একটু। ভোরের আলো। চাঁদ জানতেও পারল না, ঐ তো তার মিষ্টি তারা পুতুলটি!

তারপর?

সাতদিন পরে রাজার চৌদোলা এল। ডুরে শাড়ি পরল পাপুই। পায়ে মল বাজাল। কানে দুল সাজাল। চৌদোলায় দুলে দুলে পাপুই রাজাকে গান শোনাতে গেল।

সোনা-ঝুরঝুর হাসি

হিমসাগরের রঙ যেমন রুপো-ঝরানো সাদা, শরৎরানীর আকাশ যেমন হাসি-মাখানো নীল, ভোরবেলাকার সূর্যি যেমন সোনা-ছড়ানো রঙিন, তেমনি যেন সকল রঙের রঙ-মেশানো ছবি-সাজানো একটি রাজবাড়ি।

আর ?

সন্ধ্যারাতের একটি তারা যেমন হাসে ঝলমল, গাছের ডালে একটি পাখি যেমন নাচে ঝুমঝুম, পদ্মপাতায় শিশির ফোঁটা যেমন দোলে টলমল, রাজবাড়িতে একটি তেমন রাজকন্যা।

রাজকন্যে সাত বছরের ছোট্টটি।

কন্যের মুখটি যেমন মিষ্টি, মুখের কথা তেমন মিষ্টি।

গায়ের রঙটি যেমন মিষ্টি, গলার গানটি তেমন মিষ্টি।

কিন্তু সবচেয়ে মিষ্টি কী ?

রাজকন্যের মিষ্টি মুখের হাসি। রাজকন্যে হাসলে যেন চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ে। ফিনিক দিয়ে।

হঠাৎ এক কাণ্ড হল! কী হল ?

রাজকন্যে হাসতে ভুলে গেল।

সে কী!

রাজকন্যে আর হাসে না।

সাত-সাতটি দিন পেরুল। রাজকন্যা হাসে না।

সাত-সাতটি রাত কাটল। রাজকন্যা হাসে না।

রাজকন্যার মুখ ভার। মুখ তার অন্ধকার। কে তার হাসি চুরি করল?

রাজবাড়িও অন্ধকার।

রানীমার চোখ টলমল। চোখের জলে বুক ভেসে যায়।

রাজামশাই ভেবে ভেবে কান্না চাপেন। বুক ভেঙে যায়।

কবরেজ এল। হাকিম এল। বদ্যি এল। তিনমুণ্ডু এক করল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলল। সাতশো পাতার ফর্দ এঁটে সটকে গেল। কিছুতেই কিছু হল না। রাজবাড়িতে হায়-হায় পড়ে গেল। অমন যে সোনার টুকরো মেয়ে তার একী হল!

তারপর?

ডিড্ডিম, ডিড্ডিম-ডিম। ঢেঁড়া পড়ল। এ-রাজ্যে সে-রাজ্যে ঢাকিরা ঢাক পিটিয়ে পিটিয়ে হেঁকে গেল, "রাজার মেয়ের হাসি চুরি গেছে। রাজকন্যে হাসতে ভুলেছে। যে মেয়ের মুখে হাসি ফিরিয়ে এনে দেবে, রাজা তাকে রাজ্য দেবেন।"

ঢেঁড়া পড়ল, আশ্চর্য! কেউ এল না!

এক দিন যায়। দু' দিন যায়। তিন দিন যায়। চার-পাঁচ-ছ' দিন যায়। তবু কেউ এল না।

হায়! হায়! কেউ বুঝি এল না সত্যি আর! আর বুঝি পেল না রাজকন্যা হাসি ফিরে, তার মিষ্টি মুখে!

ছ'দিনের রাত গড়াল।

রাত গড়িয়ে ভোর হল।

সূর্যিঠাকুর মুখ তুলল।

আলো ফুটল।

পাখি ডাকল।

রাজকন্যের ঘুম ভাঙল।

ঠিক তক্ষুনি রাজবাড়ির সিংদরজায় ঘা পড়েছে। কে যেন কাঁপা গলায় গেয়ে উঠেছে, "জয় হোক রানীমার। জয় হোক রাজামশায়ের।"

দ্বারী হাতের লাঠি ঠুকে হাঁক দিলে, "কৌন হ্যায়।"

"আমি হ্যায় বাবা, আমি হ্যায়।"

দ্বারী সিংদরজার সামনে এল। দেখল এক খুনখুনে বুড়ি দাঁড়িয়ে। লাঠি ধরে ঠকঠক করে কাঁপছে।

দ্বারীকে দেখে বুড়ি বললে, "আমি রাজামশায়ের সঙ্গে দেখা করব। আমি রাজকন্যার অসুখ সারাব বলে এসেছি।"

বুড়ির মুখের কথা শেষ আর হল না।

দ্বারী হাঁকল।

সেপাই ছুটল।

শান্ত্রী নাচল।

মন্ত্রী উঠল।

সবাই জুটল।

রাজবাড়ি সরগরম। হৈ-হৈ, রৈ-রৈ। সাড়া পড়ে গেল, "এসেছে, এসেছে।"

রাজবাড়ির তুলসী মঞ্চ। সেখানে সকালের রোদ এসে পড়েছে। ছড়িয়ে গেছে সোনার রোদ। সোনার মেয়ে সেই রোদে এসে বসল। বুড়ি বসল তার সামনে। হাঁ করে চেয়ে রইল বুড়ি রাজকন্যার মুখের দিকে। অনেকক্ষণ। বসে থাকতে থাকতে একটি তুলসী পাতা ছিঁড়ে নিল বুড়ি গাছ থেকে। খকখক করে কেশে উঠল। তুলসী পাতাটা রাজকন্যার মাথায় ছিঁড়ে, ছড়িয়ে দিলে। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে। তারপর বললে, "হয়েছে মা। এবার তুমি যাও। খেলা করগে।"

তুলসীমঞ্চের পাশ থেকে রাজকন্যা উঠে গেল দাসীর ঘরে। আর গম্ভীর মুখে বুড়ি উঠে গেল রানীর ঘরে।

রানী কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "কী দেখলেন মা? মায়ের আমার কী হয়েছে?"

বুড়ি ভারী গলায় উত্তর দিলে, "তোমার মেয়ের হাসি চুরি যায় নি মা। হাসি ফুরিয়ে গেছে।"

চমকে উঠলেন রানী। জিজ্ঞেস করলেন, "সে আবার কী! কেমন করে হাসি ফুরয়?"

বুড়ি মাথা নাড়লে। ফোকলা দাঁতে হেঁ-হেঁ করে হাসলে। হাসতে হাসতে বললে, "হয় মা, হয়। কেমন জান? এই যেমন সোনার বাটি ভর্তি দুধে চুমুক দিলে দুধ ফুরয়। যেমন গাওয়া ঘি ভর্তি সোনার পিদিমে আলো জ্বলতে জ্বলতে ঘিও ফুরয়, পিদিমও নেভে। তেমনি হাসতে হাসতে হাসিও নেভে। ফুরিয়ে যায়। এতে অবাক হবার কিচ্ছু নেই।"

রানীর চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। বললে, "তা হলে মেয়ে

কী আমার আর কোনদিন হাসবে না ?”

বুড়ি আবার ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, “হাসবে গো, হাসবে। কিন্তু ব্যামোটা বড় কঠিন রকমের। দাওয়াই যোগাড় করাও তেমনি শক্ত। পারবে কি তোমরা ?”

সোনার প্রতিমার মত রাজরানী। বুড়ির পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে লুটিয়ে পড়লেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, “পারব মা, পারব। আমার বুকের বাছা ঐ একটি মেয়ে। তার মুখে হাসি ফিরিয়ে আনার জন্যে যা বলবে, আমরা তাই করব।”

“বেশ! তাহলে একটু থির হও মা লক্ষ্মী! ওষুধটা মন দিয়ে শুনে নাও।”

রানী হন্তদন্ত হয়ে উঠে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, “কী মা ? ওষুধটা কী ?”

বুড়ি বললে, “হাতি।”

রাজা অবাক হলেন, “হাতি!”

রানী চমকালেন, “হাতি!”

“হ্যাঁ মা, হ্যাঁ। হাতি! একটি সাত বছরের হাতি। তোমার মেয়ের যেদিন জন্ম, ঠিক সেইদিনে জন্মেছে যে-হাতি, তার কান্না যখনই তোমার মেয়ের কানে পৌঁছবে, তখনই ও আবার হাসবে। ওর হাসি ফিরে আসবে।”

রাজা গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, “এমন হাতি পাই কোথা ?”

রানী হতাশ হয়ে কেঁদে পড়লেন, “হাতির খোঁজে যাই কোথা ?”

বুড়ি বললে, “সে-কথাটাও শুনে নাও। একদল লোক পুবে পাঠাও। একদল লোক পশ্চিমে হাঁটাও। একদল লোক দক্ষিণ ছাড়ুক। একদল লোক উত্তর বাড়ুক। এই চারদল লোক চলতে চলতে যেখানে গিয়ে মিলবে, ঠিক সেখানে এই হাতিটি দেখতে পাবে।”

অমনি সাজ সাজ রব পড়ে গেল। চারদিকে চার হাজার রাজসৈন্য হাতির খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

একদল যায় মরুর দেশে।

একদল যায় গহন বনে।

একদল যায় পাহাড় চূড়ায়।

একদল যায় নদীর বুকে।

পাহাড় চূড়ায় শব্দ ওঠে।

নদীর জলে তুফান ছোটে।

গহন বনে গাছের কাঁপন।

মরুর দেশে বালির নাচন।

যেতে যেতে সাত মাস সাত দিন কেটে গেল। চারদিক থেকে চার হাজার রাজসৈন্য এক জায়গায় এসে পড়ল। মিলে গেল।

এ এক বন। গভীর বন। এই বনে চার হাজার রাজসৈন্য তাঁবু গেড়ে বনের এ-কোণ, সে-কোণ ঘুরে ঘুরে সাত বছরের হাতি খুঁজতে লাগল।

ক'দিন কেটে গেল। কিন্তু হাতি কই?

একদিন হঠাৎ সবাই থমকে গেল। কে যেন গান গায়!

গভীর বন। গাছের ছায়ায় অন্ধকারে পথ-পাথালির চিহ্ন নেই। জন-মানুষের দেখা নেই। অথচ গান গায় কে?

সঙ্গে সঙ্গে হুস-হাস। ফুস-ফাস। চার হাজার রাজসৈন্য চার হাজার গাছের ফাঁকে লুকিয়ে পড়ল। চুপচাপ। ঘাপটি মেরে তাকিয়ে রইল।

গানের সুর এগিয়ে আসছে। কাছে।

আরও কাছে।

তারপর কী দেখল চার হাজার রাজসৈন্য? দেখল, একটি ছোট্ট হাতি। হাতির পিঠে একটি ছোট্ট ছেলে। দুলছে। গান গাইছে। এগিয়ে আসছে। আঃ কী মিষ্টি গান!

আর কী দেখতে হয়! চার হাজার সৈন্য। আট হাজার হাত ওপরে তুললে। "হা-রে-রে রে" করে চেঁচিয়ে উঠল। হাতির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ছেলের গান চমকায়।

হাতির চলন থমকায়।

এক হাজার চেঁচাল, "নাম কী?"

এক হাজার চেঁচাল, "বাড়ি কোথা?"

এক হাজার চেঁচাল, "কার হাতি?"

এক হাজার চেঁচাল, "বয়স কত?"

ছেলেটা সামলে নিলে। আস্তে বললে, "আজ্ঞে আমার নাম মংলু। আমার হাতির নাম রাজপুত্তুর। আমার বন্ধু। হাতির বয়স সাত। আমার বয়স সাত। আজ্ঞে আপনারা কারা?"

মংলুকে আর কথা কইতে হল না। চার হাজার রাজসৈন্য চেঁচিয়ে উঠল, "মার-মার, ধর-ধর, কাট-কাট!" ঝাঁপিয়ে পড়ল হাতির ওপর। মংলুকে হাতির পিঠ থেকে তুলে নিলে। পাখির মত আকাশে ছুঁড়ে দিলে। মংলু, "ও মা গো" বলে ককিয়ে কেঁদে উঠল। আকাশ থেকে আছাড় খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

লোহার শেকল বাঁধা হল হাতির পায়ে।

লোহার শেকলের ফাঁস লাগল হাতির গলায়।

"হেঁইও মারি জোয়ান ঠেলা," চার হাজার রাজসৈন্য হাঁক পাড়লে! শেকলে টান মারলে। হাতিকে নিয়ে চলল। টানতে টানতে।

"ছেড়ে দাও, আমার হাতিকে ছেড়ে দাও।" মংলু ছোট্ট দুটি হাত বাড়ালে। রাজসৈন্যের পায়ে পায়ে লুটিয়ে লুটিয়ে কেঁদে উঠল।

চার হাজার রাজসৈন্য, তারা শুনবে না মংলুর কথা। তারা দেখবে না মংলুর দিকে চেয়ে। তারা মাড়িয়ে দিল মংলুকে। মাটিতে

মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মংলু। পড়ল, আবার উঠল। না, সে ছাড়বে না। কিছুতেই যেতে দেবে না তার বন্ধুকে। তার রাজপুত্তুরকে। ছুটে গিয়ে মংলু পড়ে গেল রাজপুত্তুরের পায়ের সামনে। ঠেলে দিল তাকে রাজসৈন্যরা। মংলু রাজসৈন্যের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে কেঁদে পড়ল, "ওগো ছেড়ে দাও, ওগো ছেড়ে দাও।"

শুনল না রাজসৈন্যরা। তারা মংলুকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেললে। বেঁধে, হাতিকে টানতে টানতে বন পেরুল। মাঠ ছাড়ল। ঘাট ডিঙুল। মংলুর চোখের আড়ালে চলে গেল।

মংলু গাছের বুকে মাথা ঠুকে, গাছের বুকে হাত জড়িয়ে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল।

কাঁদতে কাঁদতে দিন গড়াল।

রাত ফুরুল। আলো ফুটল।

কেউ এল না মংলুর কান্না শুনে।

গভীর বনে মংলু ক'দিন কাঁদল, কেউ শুনল না। ক'দিন ধরে একটি ছোট্ট ছেলের কান্না বনে বনে, গাছে গাছে ফিরেছে, কেউ জানল না।

একদিন মংলুও জানতে পারল না কিচ্ছু। জানতে পারল না, আলো নিভছে, না জ্বলছে। দিনের আলো ফুটছে, না রাতের কালো নামছে। দিনের পাখি ডাকছে, না রাতের পেঁচা হাঁকছে। কাঁদতে কাঁদতে নিভে গেছে মংলুর দুটি চোখের দুটি তারা। চির-দিনের মত। মংলু অন্ধ।

একদিন আর পারছিল না মংলু। কাঁদতে পারছিল না। ভাঙা বাঁশির সুরের মত ওর কান্না ভেসে আসছিল। থেকে থেকে।

কে যেন ডাকল এমন সময়, "কেঁদো না মংলু, কেঁদো না। আমি আছি। ভয় কী?"

আহা! কী মিষ্টি গলা!

ফিরে তাকাল। দেখতে পেল না। তার চোখে আলো কই? সে যে অন্ধ! চারিদিক অন্ধকার।

"আমি বলছি তুমি আবার তোমার রাজপুত্তুরকে ফিরে পাবে। তোমার সব দুঃখের শেষ হবে।"

বলতে বলতে কে যেন ওর বাঁধন খুলে দিচ্ছে!

মংলু বুঝতে পারল না, কে? কিন্তু আর সবাই দেখল। দেখল বনের গাছ। দেখল বনের ফুল। দেখল বনের লতাপাতা। এ-যে বনের দেবী!

বনদেবী হাতটি বাড়িয়ে দিল মংলুর হাতে। বললে, "এস মংলু। তোমায় রাজপুত্তুরের কাছে নিয়ে যাব।"

বনদেবীর হাত ধরলে মংলু। অন্ধ চোখে কাঁদতে কাঁদতে বনের পথে পা বাড়াল।

বনের পথে মংলু কাঁদছে অন্ধ চোখে রাজপুত্তুর-হাতির জন্যে।

রাজবাড়িতে রাজপুত্তুর-হাতি কাঁদছে মংলুর জন্যে।

কই? হাতির কান্না শুনে রাজকন্যা তো হাসি ফিরে পায় নি?

তবে?

সেদিন ভোর হল।

রাজবাড়ির সিংদরজার সামনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। সে ডাকছে, চেঁচিয়ে, "রাজপুত্তুর-র-র।"

দ্বারী তেড়ে এল, "কে রে?"

সে বললে, "আমার রাজপুত্তুর কোথা? আমার রাজপুত্তুর? কোথা তাকে বন্দী করে রেখেছ?" আবার ডাকল সে, "রাজপুত্তুর-র-র।"

দ্বারী দেখল, একটা অন্ধ ছেলে। "হট" বলে এক ঠেলা মারলে। ফেলে দিলে রাস্তায়।

ঠিক তখুনি রাজকন্যা যাচ্ছিল দাসীর হাত ধরে। তার হাতে ফুলের সাজি। সে যাচ্ছে মন্দিরে।

দাসীর হাত ছাড়িয়ে নিল রাজকন্যা। ফুলের সাজি ফেলে দিল। ছুটে এল। দ্বারীর হাত ধরে আকুল হয়ে বললে, "না, না। মের না,

মের না ওকে।”

তুলে নিল রাজকন্যা অন্ধ ছেলেকে ধুলো থেকে। গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিলে। জিজ্ঞেস করলে, “কী হয়েছে ভাই তোমার? খিদে পেয়েছে?”

“না।”

“ভিক্ষা নেবে?”

“না, না।”

“কাপড় চাইছ?”

“না, না, না। আমার রাজপুত্তুরকে ফিরিয়ে দাও।”

রাজকন্যা অবাক হল। জিজ্ঞেস করল, “কে তোমার রাজপুত্তুর? আমার তো কোন ভাই নেই!”

“তোমার ভাই কেন হবে? রাজপুত্তুর আমার বন্ধু। আমার হাতি। তোমাদের লোকেরা তাকে ধরে এনেছে। বেঁধে এনেছে।”

চমকে উঠল রাজকন্যা। আপন মনে ভাবল, “ও বুঝেছি। তাই দেখি ক'দিন ধরে হাতিশালে নতুন হাতি। ছোট্ট হাতি। তাই বলি ছোট্ট হাতি কাঁদে কেন রাতদিন।”

রাজকন্যে দ্বারীর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে উঠল, “ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও।”

দ্বারী ভয়ে সরে গেল।

অন্ধ ছেলের হাত ধরল রাজকন্যা। বললে, “আমার সঙ্গে এস।” ছুট দিল রাজকন্যা রাজপুরীর হাতিশালের দিকে।

অন্ধ ছেলে রাজকন্যার হাত ধরে ছুটতে লাগল। ডাকতে লাগল, “রাজপুত্তুর-র-র।”

আহা! হাতিশালে কাঁদছে রাজপুত্তুর! তার পায়ে শেকল বাঁধা। কাঁদছিল আপন মনে। মংলুর জন্যে।

কাঁদতে কাঁদতে হঠাৎ চমকে ওঠে হাতি। কে যেন ডাকে তার নাম ধরে! এ যে তার চেনা গলা! এ যে তার মংলুর স্বর।

হ্যাঁ, সত্যিই তো! ঐ তো তার মংলু! রাজকন্যার হাতটি

ধরে ছুটে আসছে !

আর দেখতে হয় ! কোথায় কান্না আর কোথায় কী ! নেচে উঠল হাতি। মাথায় শুঁড় তুলে উঠল। কানের পাতা কেঁপে উঠল। হেলে-তুলে-গড়িয়ে ডেকে উঠল।

মংলু দু' হাত বাড়িয়ে আকুল হয়ে এগিয়ে গেল। বললে, "কই ? কই ? কই, তুই রাজপুত্তুর ?"

রাজকন্যা হাতটি ছুঁয়ে মংলুকে নিয়ে গেল রাজপুত্তুরের কাছে। অমনি রাজপুত্তর শুঁড়টি দিয়ে জড়িয়ে ধরল মংলুকে। পিঠে তুলে নিল।

মংলু দুটি হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল রাজপুত্তুরের গলাটি। জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল। সে কী কান্না ! সমস্ত আকাশ ভেঙে যেন মেঘের কান্না ! কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি আর দেখতে পাই না রে, দেখতে পাই না। তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে আমার চোখ গেছে। কই, তোর মুখখানা কই ?"

রাজকন্যা কেঁদে ফেললে। মাহুতকে বললে, "খুলে দাও। এক্ষুনি হাতির পায়ের শেকল খুলে দাও।"

রাজকন্যার কথা কে ঠেলবে ? হাতির বাঁধন খুলে গেল।

মংলুকে পিঠে নিয়ে বেরিয়ে এল রাজপুত্তুর হাতিশাল থেকে। বাইরে। হাঁটা দিল।

"শোন।" ডাকল রাজকন্যা হঠাৎ। ওর গাল দুটি ভেসে গেছে চোখের জলে। "শোন ভাই।"

হাতি দাঁড়াল।

রাজকন্যা বললে, "আমার বাবা তোমার রাজপুত্তুরকে ধরে এনেছেন। রাজপুত্তুরের জন্যে কেঁদে কেঁদে তোমার চোখ দুটিও হারিয়ে গেছে। কেউ জানবে না এ-কথা কোনদিন। কেউ জানবে না তোমার এ দুঃখের কথা। জানলেও কেউ তো আর পারবে না তোমার চোখ দুটিতে আলো ফিরিয়ে দিতে। আমি ছোট্ট। সত্যি বলছি আমি কিচ্ছু জানি না। আমি কোন দোষ করি নি। শুধু

একটি কথা তোমায় বলব। রাখবে?"

"কী কথা?"

"একটিবার তুমি হাতির পিঠ থেকে নেমে আমার কাছে আসবে?"

রাজপুত্তুর শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরল মংলুকে। নামিয়ে দিল রাজকন্যার পাশে।

আঁচল দিয়ে মংলুর চোখের জল মুছিয়ে দিল রাজকন্যা। চুনি-পান্নার হারটি খুলে নিল নিজের গলার থেকে। পরিয়ে দিল মংলুর গলায়।

মংলু চেঁচিয়ে উঠল, "না, না। চাই না আমার।"

কথা শেষ হল না। এ কী!

কী?

চুনি-পান্নার মালার আলো মংলুর গলায় দুলে উঠছে। যেন সেই মালার আলো তার চোখের তারায় ভেসে উঠছে! মংলুর চোখে যেন আলো নামছে। একটু-একটু। আরও একটু।

হ্যাঁ, সত্যিই তো! মংলু দেখতে পেয়েছে সকালের সোনার রোদ। সোনার রোদে রূপার চাঁদের মত একটি ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে। তার সামনে।

এ কী সত্যি!

সত্যি! সত্যি! সত্যি! হঠাৎ হেসে উঠল মংলু, "হা-হা-হা।"

ঝরনার সুরের মত মিষ্টি হাসি। ভোরের ফুলের মত রঙিন হাসি! হাসতে হাসতে গড়িয়ে গেল মংলু। ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল রাজকন্যার হাতটি।

ওমা! অমনি রাজকন্যা হেসে উঠেছে, "হি-হি-হি!" এতদিনের হারিয়ে যাওয়া হাসি হঠাৎ ফিরে পেয়েছে রাজকন্যা। মুখখানি তার উছলে গেল আলোতে-হাসিতে। সে কী আনন্দের হাসি! কাঁচা রোদের মত সোনার হাসি।

ভোরের ফুল, কাঁচা রোদ, ঝরনার সুর সব মিলিয়ে সে এক

হাসির রাশি। সেই হাসির সুরে সুর মিলিয়ে রাজপুত্তুর তুলে নিল মংলুকে। তুলে নিল রাজকন্যাকে নিজের পিঠে।

ওপরে আকাশ। নীল। আলো তার উপচে গেছে। নীল আকাশের নিচে একটি মিষ্টি ছেলে, একটি মিষ্টি মেয়ে হাতির পিঠে বসে। ওরা দুলছে। দুলতে দুলতে এগিয়ে যাচ্ছে। ওরা হাসছে। হাসতে হাসতে তাকিয়ে দেখছে।

দেখতে পেয়েছেন রাজা। হেসে উঠেছেন।

দেখতে পেয়েছেন রানী। হেসে ফেলেছেন।

মন্ত্রী হেসেছেন।

শান্ত্রী হেসেছে।

সিপাই হেসেছে।

হেসেছে হাতিশালের হাতিগুলো। আস্তাবলের ঘোড়াগুলো। উটগুলো।

সব্বাই হেসেছে। হেসে কুটোকুটি হয়ে লুটোপুটি খেয়েছে। রাজবাড়িতে হাসির হাট বসে গেল।

কিন্তু কেউ দেখতেও পায় নি রাজকন্যার পুতুল-পুতুল মাছরাঙা সে-ও আজ মুচকি মুচকি হাসছে!

চ্যাং ঝোলা

এক রাজা। একদিন খুব সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল রাজামশায়ের। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে গেলেন। এ কী! উঠতে পারলেন না। যাঃ, রাজামশায়ের বাঁ পা-টা বিছানার গদির সঙ্গে আটকে গেছে। কী মুশকিল!

রাজা বাঁ দিক হেললেন। পা নড়ল না।

ডান দিক বেঁকলেন। পা সরল না।

মাথা ঝাড়লেন। পা হেলল না।

কোমর দোলালেন। পা দুলল না।

গা তুললেন,
হাত ছুঁড়লেন,
পেট ফোলালেন,
পিট ফেরালেন,
কান মুললেন,
নাক টানলেন,
চুল ছিঁড়লেন,

জিব ভেঙালেন।

পায়ের বয়েই গেছে! সে যেমন ছিল, তেমনি আটকে রইল। তাইতো, কী হল?

তাইতো, কী হল! রানী ছুটে এলেন।

তাইতো, কী হল! মন্ত্রী ছুটে এলেন।

তাইতো, কী হল! শান্ত্রী ছুটে এল।

তাইতো, কী হল! দাসী ছুটে এল।

রানী ডান হাত টানেন।

দাসী বাঁ হাত টানে।

মন্ত্রী কোমর ঠেলেন।

শান্ত্রী ডান পা টানে।

টানাটানি, হেঁচড়া-হেঁচড়ি, ধামসা-ধামসি, ঠেলাঠেলি। কিছুতেই কিছু হল না। সবাই দড়দড় করে ঘেমে নেয়ে একসা।

যখন পা কিছুতেই উঠল না, তখন রাজা ভ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ করে কান্না জুড়ে দিলেন। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমার কী হল রে।" রাজার সে কী কান্না!

ডাক ডাক বদ্যি ডাক!

বদ্যিবাটির বদ্যি এল। বদ্যিমশাই রাজার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলে সুড়সুড়ি দিলেন। তারপর ভাবলেন। ভাবতে ভাবতে নাকে নস্যি গুঁজলেন। কড়িকাঠের দিকে মুখ তুললেন। তুড়তুড়ি কাটলেন, তুড়-ড়-ড়। তারপর একটা চিনেবাদামের খোসা বার করলেন ঝুলি থেকে। রাজাকে বললেন, "দুগগা নাম জপতে জপতে এটা গিলে ফেলুন।"

রাজা খোসা নিয়ে দুগগা নাম জপতে লাগলেন। তারপর গালে দিলেন। গিলে ফেললেন। কোঁৎ করে রাজার মুখ থেকে একটা আওয়াজ বেরুল। ব্যস! যেই আওয়াজ হওয়া, অমনি বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা হুহু শব্দে ফুলতে সুরু করেছে। ফুলতে ফুলতে প্রথমে একটা ঘটির মত, তারপর একটা হাঁড়ির মত, তারপর

একটা ঘড়ার মত ঢোল হয়ে গেল। সব্বনাশ!

তাই না দেখে রাজা তো আরও জোরে কেঁদে উঠলেন, "এ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ।" নাকি সুরে সে কী কান্না! কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "বঁদ্যিকে শূলে দাঁও।"

বদ্যি শূলে চাপল।

এবার?

ডাক ডাক কবরেজ ডাক।

কবরহাটার কবরেজ এল।

কবরেজমশাই রাজার পায়ে খিমচে দিলেন। নাকে টুসকি মারলেন। তড়বড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "উই চিংড়ি, না ফড়িং? ফড়িং না তেলেপোকা? তেলেপোকা, না আরসুলা? আরসুলা, না টিকটিকি?"

রাজা কাঁদছেন। নাকের জল টানছেন। টানতে টানতে বললেন, "আজ্ঞে বুঝতে পারছি না। একটু খোলসা করে বলুন।"

কবরেজ ধমক দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কে চেটেছে?"

ধমক খেয়ে চমকে গেলেন রাজা। আঁৎকে উঠে মুখ ফসকে বলে ফেললেন, "আজ্ঞে বদ্যি চেটেছে।"

অমনি কবরেজমশাই ফস করে নিজের টিকির একটা চুল ছিঁড়ে বলে উঠলেন, "সর্দি। আপনার পায়ে সর্দি হয়েছে। বুড়ো আঙুলের ঠাণ্ডা লেগেছে।"

রাজা আমতা আমতা করে জিজ্ঞেস করলেন, "আজ্ঞে, সর্দি পায়ে কেমন করে হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ হয়! প্রথমে নাক ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ। নাক থেকে নামতে নামতে বুক ঘড়ঘড়। বুক থেকে নামতে নামতে পেট চড়চড়। আর পেট থেকে নামতে নামতে পা খচখচ।"

তারপর কবরেজমশাই কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। চোখ বুজে দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন। একটু পরে ঠোঁট বিড়বিড় করতে করতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠলেন, "সলতে!"

একঘর লোক চিৎকারে চমকে উঠল।

রাজার ভিরমি লাগতে লাগতেও লাগল না। সামলে গেলেন কোন রকমে।

রানী জোড় হাত করে বললেন, "আজ্ঞে?"

কবরেজ আবার চেঁচালেন, "সলতে আন।"

"আজ্ঞে সলতে না পলতে?"

"সলতে।"

রানী ছুটলেন সলতে আনতে।

সলতে এল।

কবরেজ সরষের তেলে সলতেটা ভেজালেন প্রথমে। তারপর একটা নরুন দিয়ে রাজার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলের নোখের একটু কোণা কেটে নিলেন। সলতের সঙ্গে নোখটা জড়িয়ে রাজাকে বললেন, "সাত বার ঘুঘুর ডিম, ঘুঘুর ডিম আউড়াতে আউড়াতে এটা চিবিয়ে গিলে ফেলুন।"

রাজা সলতেটা চিবুতে চিবুতে আউড়াতে লাগলেন ঃ

ঘুঘুর ডিম

ঘুঘুর ডিম

ঘুঘুর ডিম

ঘুঘুর ডিম

ঘুঘুর ডিম

ঘুঘুর ডিম

ঘুঘুর ডিম।

শেষবার ঘুঘুর ডিম বলে রাজা গিলে ফেলেছেন সলতে। মুখে গোঁৎ করে আওয়াজ! ব্যস! আর দেখতে আছে! অমনি সেই বাঁ পায়ের ঘড়ার মত বুড়ো আঙুলটা ফস করে ফানুসের মত লম্বা হয়ে গেল। লম্বা হয়ে দেখো, দেখো ওপর দিকে উঠছে! আরি বাবা! সত্যিই তো! উঠতে উঠতে আঙুলটা, পা-টা একেবারে কড়িকাঠে আটকে গেল। রাজার মুণ্ডু রইল মাটির দিকে। ঠ্যাং

উঠল শূন্যের দিকে। রাজা ঠ্যাং উঁচিয়ে মাথা নামিয়ে ঝুলতে লাগলেন! বাদুড়-ঝোলা।

কিছু বোঝাবার আগেই কেঁদে ফেললেন রাজা, "প্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ।" আরও জোরে। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, "কবরেজের গর্দান নাও।"

কবরেজের গর্দান গেল।

চার-চার দিন রাজামশাই শূন্যের দিকে ঠ্যাং উঁচিয়ে আর মাটির দিকে মাথা ঝুলিয়ে দুলতে লাগলেন। কথাটা আর চাপা রইল না। সারা রাজ্যে ঢি-ঢি পড়ে গেল। সবাই বললে, "রাজার চ্যাং-ঝোলা অসুখ করেছে। রাজা কড়িকাঠে ঠ্যাং ঠেকিয়ে ঝুলছেন।"

শেষকালে যখন রাজার অসুখ সারল না, কড়িকাঠ থেকে ঠ্যাং নামল না, তখন রাজবাড়ির লোকেরা ঢেঁড়া পিটিয়ে গেল। ঢেঁড়া পিটিয়ে বলে গেল, "রাজার চ্যাং-ঝোলা অসুখ যে ভাল করে দিতে পারবে, রাজা তাকে সাত ঘড়া মোহর দেবেন। সাতটা বাড়ির মালিক করে দেবেন।"

সেই দেশে ছিল একটি ছেলে। বড় দুঃখী। কেউ ছিল না তার। ছিল একটি বেড়াল। সারাদিন এর ঘর, তার দোর ঘুরে ঘুরে ঘরকন্নার কাজ করে দেয়। তার বদলে আধ পেটা খেতে পায়। সারাদিন কাজ করে। তারপর পড়বে। লিখবে। পড়বে ছেঁড়া-ছেঁড়া বই নিয়ে। ভাঙা-ভাঙা শিলেট নিয়ে। ও যখন পড়বে, বেড়ালটা বসে থাকবে সামনে। ও যখন লিখবে, বেড়ালটা বসে বসে দেখবে আর ডাকবে। এত কষ্ট করেও সে কোনদিন ভোলে নি লিখতে, পড়তে।

একদিন ছেলেটা শুনল রাজার অসুখের কথা। শুনল বলে ভাবল। ভাবল, একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না? কদ্দিন আর এমনি করে কষ্ট করা যায়।

ভাবতে ভাবতে সেদিন সে কাজে গেল না। ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। বেড়ালটা মাথার কাছে বসে বসে দেখতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে বেড়ালটার পিঠে হাত বুলিয়ে ছেলেটা বললে, "কি রে? কি দেখছিস?"

বেড়ালটা চেয়েই রইল।

ছেলেটা আবার বললে, "আজ আর কাজ করতে যাব না, বুঝলি। আজ উপোস! পারবি না একদিন উপোস করে থাকতে?"

বেড়াল আর কি বলবে? কথা বলতে পারলে তবে তো!

এবার নিজের কোলে টেনে নিল বেড়ালটাকে ছেলেটা। ওর চোখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললে, "জানিস রাজামশায়ের চ্যাং-ঝোলা অসুখ করেছে। কি জানি বাবা, এমন অসুখের নাম কখনও শুনি নি। কোন রকমে যদি রাজামশায়ের অসুখ ভাল করে দিতে পারি, তাহলে কি আর এমনি করে কষ্ট করতে হয়? দূর! আমি কি আর সারাতে পারি? আমি হাকিম, না বদ্যি!

বেড়ালটা বোধ হয় ছেলেটার কথা বুঝতে পারলে। তাই মারলে লাফ, তিড়িং। উঠে দাঁড়াল ছেলেটার কোল থেকে মাটিতে। মুখ দিয়ে ছেলেটার জামা ধরে টান দিলে। যেন বলছে, "উঠে চল, আমার সঙ্গে উঠে চল।"

ছেলেটা ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। বললে, "কোথা যাব? দাঁড়া দাঁড়া। আমার জামা ছিঁড়ে যাবে।"

যাবে তো যাবে। সে তবুও টানছে। তার যেন তর সইছে না।

ছেলেটা উঠে দাঁড়াল।

তারপর?

ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ল বেড়ালটা। ছুটল।

ছেলেটাও ছুটল।

আগে ছুটল বেড়ালটা।

পেছনে পেছনে ছেলেটা।

“কোথা যাস রে, কোথা যাস ?” চেঁচিয়ে ওঠে ছেলেটা।

কোথা যায় কেউ জানে না। বেড়াল জানে। জানে বলেই ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে শহর গেল।

শহর গেল, গ্রাম পড়ল। সবুজ-সবুজ মাঠ গেল। জল-চকচক নদী গেল। ফল-ঝলমল বাগান গেল। মৌটুসকি পাখি গেল। ছেলে গেল। মেয়ে গেল। চাষী গেল। লাঙল গেল। গরু গেল। ভেড়া গেল।

তারপর ?

গ্রাম পেরিয়ে এল গা-ছমছম গভীর বন।

হুক! হুক! হুক! পেঁচা-ডাকা অন্ধকার।

গাঁক! গাঁক! গাঁক! বাঘ-ডাকা অন্ধকার।

হুক্কা হুয়া! হুয়া! হুয়া! শেয়াল-ডাকা অন্ধকার!

হিস! হিস! হিস! সাপ-ডাকা অন্ধকার। অন্ধকার। শুধু অন্ধকার। গা-ছমছম গভীর বনে দিনের বেলা অন্ধকার।

“অন্ধকারে কে যায় রে, কে যায় ?” কে যেন ডাকল!

“কে যায় রে কে যায় ?” তাই তো! সত্যি-সত্যি ডাকল!

বেড়ালটা ছুটতে ছুটতে থমকে দাঁড়াল।

ছেলেটাও ছুটতে ছুটতে থমকে থামল। ছেলেটা চমকে চেয়ে দেখল একটা ল্যাজের মত কি সুড়-সুড় করে একটা ইয়া বড় গর্ত থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে ঠিক বুঝতেই পারল না কী ওটা? সাপ ওটা? কেউটেটা?

“কী চাস রে? বনের ভেতর ছুটোছুটি করছিস কেন? আমরা ঘুমুতে পাচ্ছি না!” ল্যাজটা বলে উঠল।

ছেলেটা পাখির ডাক শুনেছে। গরুর হাঁক শুনেছে। বেড়ালের ম্যাঁও শুনেছে। কিন্তু ল্যাজের কথা-কওয়া কোনদিন শোনে নি তো! তাই কেমন হকচকিয়ে গেল। ভয়ে-ময়ে বলে ফেললে, “রাজার চ্যাং-ঝোলা অসুখ!”

ল্যাজটা ধমকে উঠল, "রাজার চ্যাং-ঝোলা অসুখ, তো তোমরা হেথায় কেন ?"

ছেলেটা তেমনি আমতা আমতা করে বললে, "চ্যাং-ঝোলা অসুখটা কী তাই জানতে এসেছি।"

ল্যাজ বললে, "চ্যাং-ঝোলা অসুখ, না লঙ্কা পোড়া গন্ধ ?"

ছেলেটা কেমন হাঁদা-হাঁদা হয়ে গেল। মুখটা আমচুরের মত শুকনো করে বললে, "তার মানে ?"

ল্যাজটা সড়াৎ করে ছিটকে এল। একেবারে লাফিয়ে উঠে ছেলেটার কানের গর্তে ঢুকে গেল। খানিকটা। ছেলেটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। ল্যাজটা কানের গর্তে ফিসফিস করে কথা বলতে সুরু করলে।

বাব্বা !
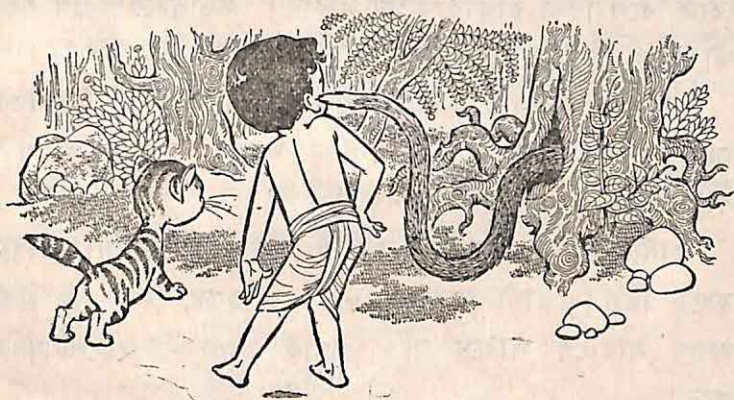
ব্যস! কথা শেষ করেই বলা-নেই, কওয়া-নেই আবার নিজের গর্তে চুপচাপ সেঁদিয়ে গেল।

ছেলেটা কী শুনল, কে জানে! চিৎকার করে হেসে উঠল। বেড়ালের গালটা টিপে লুফে নিল কোলে। তারপর ছুটল। ছুট, রাজবাড়ির দিকে।

ছুটতে ছুটতে রাজবাড়ির সিংদরজার সামনে এসে হাজির। সিংদরজার সামনে উঁকি মারল।

উঁকি মারল পিছনে।

উঁকি মারল সামনে।

তারপর আগু দেখলে, পিছু দেখলে। মারল ছুট রাজবাড়ির ভেতর দিকে।

দ্বারী হাঁকল, "ছুটল, ছুটল। বেড়াল কোলে ছেলে ছুটল।"

শান্ত্রী হাঁকল, "ঢুকল, ঢুকল! বেড়াল নিয়ে ছেলে ঢুকল। ধর, ধর।"

অমনি পঞ্চাশটা লোক পেছন পেছন তাড়া লাগিয়ে দিলে।

ছেলেটা বেড়াল-কোলে ছুটতে ছুটতে একেবারে রাজার ঘরে। ছুটে এসে রানীমার কোলে বেড়ালটা রাখলে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "রাজার অসুখ আমি সারাব, আমার লঙ্কা চাই!"

সবাই অবাক। বদ্যি গেল, কবরেজ গেল। এইটুকুনি ছোট্ট ছেলে বলে কিনা রাজার অসুখ সারাব! লঙ্কা দিয়ে অসুখ সারে! কী ছেলেমি? না, ছেলেখেলা?

ছেলেটা আকুল হয়ে বলে উঠল, "রানীমা গো, তাড়াতাড়ি লঙ্কা আন। গাওয়া ঘি-এর পিদিম আন। রাজার অসুখ না সারালে তোমরা আমার মুণ্ডু নিও!"

রানীমার মন তো কান্নায়-কান্নায় ভরেছিল। ভাবনায়-ভাবনায় মুষড়ে ছিল। রানী ভাবলেন, এত করা হচ্ছে, কেউ তো রাজার অসুখ সারাতে পারছে না। দেখাই যাক না ছেলেটার কথা শুনে!

অমনি শুকনো-শুকনো লঙ্কা এল। গাওয়া ঘি-এর পিদিম এল। পিদিমে আগুনের শিখাটি জ্বালিয়ে দিল ছেলেটা। তারপর বললে, "ঘর ছেড়ে এবার সব বাইরে যান। ঘরে থাকব আমি আর আমার বেড়ালছানা।"

সকলে একে একে ঘর ছেড়ে বাইরে গেল। ঘরের দরজা বন্ধ হল।

এবার ছেলেটা রাজার মুখের সামনে দাঁড়াল। রাজার তো

ঠ্যাং তখনও ওপরে। কড়িকাঠে। মুণ্ডুটা নিচের দিকে। মুখের দিকে চাইতেই, রাজা ছেলেটার চোখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন। ছেলেটা বললে, "রাজামশাই গো, রাজামশাই, চোখ বন্ধ কর।"

রাজা চোখ বুজলেন।

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে গাওয়া ঘি-এর প্রদীপে শুকনো-শুকনো লঙ্কাগুলো পোড়াতে লাগল। পুড়িয়ে-পুড়িয়ে একটা পোড়া লঙ্কা রাজার নাকের সামনে ধরেছে। যেই ধরা, রাজা ফ্যাঁউ-ফ্যাঁউ-ফ্যাঁউ করতে করতে, একেবারে বাজপড়ার মত আওয়াজ দিয়ে ফ্যাচ-চ-চ-চ করে হেঁচে দিয়েছেন। বাবা, সে কী সাংঘাতিক হাঁচি! যেই হেঁচেছেন, অমনি সেই কড়িকাঠে ঠেকানো ঠ্যাংটা চিঁড়ে-মুড়কির বস্তার মত ছিটকে পড়েছে বিছানার ওপরে। পড়েই ফানুসের মত বুড়ো আঙুলটা, "হুম ফটাস!" ফেটে গেছে! তারপর ভুসসসস! হাওয়া বেরিরে গেল ফাটা আঙুল দিয়ে। হাওয়া বেরুতে বেরুতে চুপসে গেল আঙুলটা। ঠিক হয়ে গেল। আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনি!

রাজা তড়াং করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। একবার নিজের পায়ের দিকে চেয়ে, তারপর অবাক হয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকালেন।

ধিন ধিন, একটু একটু নাচতে লাগলেন।

ধিন ধিন, আরও একটু একটু।

ধিন ধিন, খুব জোরে জোরে নাচতে লাগলেন।

নাচছেন। থামছেন। দেখছেন। আবার নাচছেন। তারপর হা-হা-হা করে গান গাইতে সুরু করে দিলেন। গাইতে গাইতে ছেলেটাকে কাঁধে তুলে নিলেন। বেড়ালটা কোলে নিলেন। লাফাতে লাফাতে, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বাইরে। চেঁচাতে লাগলেন, "আমি ভাল হয়ে গেছি, আমি ভাল হয়ে গেছি।"

চেঁচাতে চেঁচাতে ছেলেটাকে কাঁধে নিয়ে, বেড়ালটাকে কোলে

নিয়ে চিলের ছাতে দৌড়। চিলের ছাতে গিয়ে, খোলা আকাশের নিচে দাঁড়ালেন। আদর করে ছেলেটাকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। ওর গালে একটা চুমু খেলেন। বেড়ালের গালে একটা চুমু খেলেন। তারপর ছেলেটার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, "হ্যাঁরে, আমার কী অসুখ করেছিল ?"

ছেলেটা বললে, "আজ্ঞে রাজামশাই, আপনার নাকে একটা হাঁচি আটকে গেছল। আমি লঙ্কা পুড়িয়ে সেটা বার করে দিতেই আপনার অসুখ সেরে গেছে।"

ছেলেটার কথা শুনে রাজা সেই চিলের ছাতে কী জোর হেসে উঠলেন, "হো-হো-হো।" সে-হাসি সারা রাজ্যের লোক শুনতে পেয়েছিল। তারাও হেসে উঠেছিল রাজার হাসি শুনে।

তারপর সেই ছেলেটা আর বেড়ালটার আর কোন দুঃখই রইল না।

—